কৃষ্ণকথা

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের
অকৃপণ কৃপা-ধন্য

কান্তি পি. দত্ত

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা—১

উৎসর্গ—

যাঁর পরম করুণা আমাকে কৃষ্ণাভিমুখী তথা ঈশ্বরাভিমুখী করে
তুলবার জন্য সদা ক্রিয়াশীল—সেই

—পরম শ্রদ্ধেয় করুণাময় বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শন—

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের

পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ

গ্রন্থকার

ভূমিকা

এই অবক্ষয় ও অবিশ্বাসের যুগে—ঈশ্বর প্রসঙ্গ তথা কৃষ্ণকথা যথাযথভাবে তুলে ধরার অসুবিধা অনেক। কারণ বর্ত্তমান যুগের মানুষ যুক্তিদ্বারা যাচাই না করে কোন কিছুই গ্রহণ করে না।

আজকের মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, পরলোকেও বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা নাকি এমন এক পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, সৃষ্টির সকল রহস্যই তাদের কাছে উদ্ঘাটিত! ধর্ম্ম শুধুমাত্র আফিংয়ের নেশার মতো।

কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে—তথা কথিত আফিংয়ের নেশা যদি সমস্ত জাগতিক সুখ দুঃখকে ভুলিয়ে—চিরস্থায়ী আনন্দের অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা অন্তরে অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে—জীবনের চরম ও পরম সত্যকে উদঘাটিত করতে পারে—তখন ধর্ম্মকে শুধুমাত্র আফিংয়ের নেশা বলেই কি অগ্রাহ্য করা চলে?

প্রকৃত ধর্ম্ম কোন কুসংস্কার নয়, ধর্ম্ম মানুষকে ধারণ করে, চরম ও পরম আনন্দের সন্ধান দেয়। ঈশ্বরের কাছাকাছি মানুষকে পৌঁছে দেয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা হচ্ছে—"Ignorance is the root cause for all our sufferings." অজ্ঞতা থেকেই মানুষের সকল দুঃখ! আমাদের প্রকৃত সত্বা সম্বন্ধে আমরা অনবহিত, আমরা ঈশ্বরকেও জানিনা, নিজেদের প্রকৃত পরিচয় রাখি না—সেই হেতু দুঃখ আমাদের নিত্যসঙ্গী।

ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানের তবে পার্থক্য কোথায়?

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—একটা শক্তি এই বিরাট বিশ্বের কার্য্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

আমরা বলি সেই শক্তিই ভগবান। সেই শক্তি জড় পদার্থ নয়, সম্পূর্ণ চেতন।

একটা স্বয়ংক্রিয় (Aut‹ matic) যন্ত্রপাতির কারখানার কার্য্য ধারা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যও যেমন একজন পর্যবেক্ষক থাকে, ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্যাপী বিরাট স্বয়ংক্রিয় কারখানার কার্য্যধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য একজন সুপার ভাইজার রয়েছেন—সেই সুপার ভাইজারকেই আমরা ভগবান বলি।

জাগতিক সৃষ্টির অন্তরালে যদি সর্ব-নিয়ন্তা সেই ভগবান যদি না থাকতেন—সৃষ্টি এমন নিখুঁত (Pcrfect) হ'তে পারত কি? এত ফুল, এত পাখি, এত বিচিত্র সৃষ্টি—কি সুন্দর, আর কি নিখুঁত। সৃষ্টির অন্তরালে যদি ঈশ্বরের Calculating Brain কাজ না করত তবে কি সকল সৃষ্টিই এত নিখুঁত হ'তে পারত? ঠিক যে জায়গায় যা থাকা দরকার, ঠিক সেই জায়গাতেই তা রয়েছে। মানুষের নাক যদি সামনে না থেকে পেছনে থাকত, সুখনিদ্রার পক্ষে নিশ্চয়ই নিদারুণ ব্যাঘাত ঘটত!

আমরা মানুষেরা অনেক কিছু আবিস্কার বা সৃষ্টির জন্য বড়াই করি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন Basic thing সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি কি?

একটা ফুল, একটা লতা—এমন কি একটা ঘাসও আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি কি? প্রকৃতির রাজ্যে যা যা ছিল—তা ভেঙে-চূরে বা সমন্বয় সাধন করে আমরা কেবল মাত্র রূপান্তর ঘটাতে পেরেছি। —যা ছিল না, এমন কোন Basic thing আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি!

অন্তরালে থেকে বা প্রকাশমান হয়ে যে পরম-পুরুষ সৃষ্টির অব্যাহত ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, জীব জগতকে পালন ও পোষণ করছেন—সেই পরম পুরুষই ভগবান!

তিনি সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম, আবার বিরাট থেকে বিরাটতম। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকারও। তিনি স্ব-ইচ্ছায়

দৃশ্যমান হ'তে পারেন আবার অদৃশ্য হয়েও থাকতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান!

তিনি সব কিছুর মধ্যেই বিরাজমান, আবার কোন কিছুরই সঙ্গে বিজড়িত নন্। তিনি এক। আবার বহুর মধ্যেও নিজেকে ছড়িয়ে রাখতে পারেন।

আমরা যারা মূর্ত্তি পূজায় বিশ্বাস করি—আমরা সেই মহান শক্তিকেই মূর্ত্তির মধ্যে কল্পনা করে—তাঁর নৈকট্য বিধানের জন্য সচেষ্ট হই। মাটির মূর্ত্তি বা পাথরের মূর্ত্তির এমনিতে কোন মূল্য নেই, কিন্তু যদি কোন ভক্ত ভালবাসায় বা ভক্তিতে সেই মূর্ত্তিতে পরম শক্তিমান ঈশ্বরকে আকর্ষণ করে আনতে সমর্থ হন, তখনই ঐ মূর্ত্তি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে!

আমাদের শাস্ত্র বলে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।' শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সর্ব্বশক্তিমান সেই ঈশ্বর নিজেকে জাগতিক মানুষের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিরাকার পরমব্রহ্ম, তিনিই আবার ভক্তজনের কাছে শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যিনি নিরাকার তিনিই আকার ধারণ করে আহ্লাদিত করেছেন ভক্তজনকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতের মানুষদের প্রতি অসীম করুণায়—বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সেই কৃষ্ণতত্ত্বকেই তুলে ধরেছেন।

আলিপুর জেলে অবস্থান কালে ঋষি অরবিন্দও সেই কৃষ্ণকেই মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন। 'বাসুদেব সর্বমিতি।' যেখানে যেখানে তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়েছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জাগতিক সুখ, দুঃখ, বিদ্রোহ, বিপ্লব—সকল কিছুর উর্দ্ধে, সীমার মধ্যে অসীমকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন—ঋষি অরবিন্দ।

তাই বলছি—এই অবক্ষয় ও অবিশ্বাসের যুগেও যে কথা সকল কথার সার—সে কথার নামই কৃষ্ণকথা! এবং কৃষ্ণকথার তুলনা নেই।

এই বিশ্ব-জগত নিয়মের রাজত্ব। তাঁর সৃষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত।

যেখানেই অলৌকিকতা—সেখানেই ঈশ্বর চিন্তাধারা নয়। সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলাকে মেনে, বৈজ্ঞানিক সকল যুক্তিকে মেনে নিয়ে বা খণ্ডন করেও বলা যায় তিনি আছেন! তিনিই শাশ্বত তিনিই চিরন্তন! তিনিই আনন্দময়! এবং তিনিই পরম গতি।

কৃষ্ণকথাকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারি তেমন যোগ্যতা আমার কই?

আমি অত্যন্ত মায়াবদ্ধ, জাগতিক লোভ ও মোহের আবর্ত্তে পড়ে সতত দিশেহারা, কিন্তু আমার গুরুদেব শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর অকৃপণ কৃপা অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত আমার দেহ-মনের পাত্রে কোথাও না কোথাও হয়তো বা জড়িয়ে আছে। তাই আমি জাগতিক কার্য্যকলাপের মধ্যেও মাঝে মাঝে আকুল হয়ে পড়ি, অসীম অনন্ত-লোক থেকে অসীম করুণায় তিনি যেন বারবার আমাকে কৃষ্ণমুখী বা ঈশ্বরমুখী করে তুলবার জন্য সতত ক্রিয়াশীল।

সেই তাঁরই অনুপ্রেরণা আমাকে কৃষ্ণকথা রচনার জন্য বারবার যেন অলক্ষ্য থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

কালি আমার, কলম আমার—লিখেছিও আমি, কিন্তু লেখা আমার নয়। তাই কৃষ্ণকথা রচনার কৃতিত্বের দ্যাবী করতে পারি না আমি! তিনি যেন নিজেই নিজেকে প্রকাশ করছেন। আমি যন্ত্রের মতো সেই মহাযন্ত্রীর নির্দ্দেশেই—কাগজের বুকে কলমের আঁচড় টেনে গেছি মাত্র। ইতি—

বিনীত

কান্তি পি. দত্ত

"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়"

* * *

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥

সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় হয়েও নিজশক্তি প্রভাবে ভক্তজনকে স্বীয়দর্শন দানে সক্ষম।

* * *

অদৃশ্য অব্যক্ত হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥

—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবাস।

* * *

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

—ভাঃ ১।৩।২৮

অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেউ কেউ বা অংশাবেশ অবতার। ঐ সকল অবতারগণ প্রত্যেক যুগেই জগৎ যখন দৈত্যপীড়িত হয়—তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

* * *

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

—ব্রহ্মসংহিতা।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

—ভাঃ ১।২।১৭

কৃষ্ণকথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে চিত্তশুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ সাধুগণের পরম বন্ধু। যিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর অন্তরে অবস্থান করে কামাদি দোষ সমূহ বিদূরিত করেন।

কৃষ্ণকথা

এক

উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু স্বীয় পিতার নির্দেশেই গুরুগৃহে থেকে বেদ অধ্যয়ন করেন। এবং চব্বিশ বছর বয়সে বেদজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঋষি উদ্দালক দেখলেন যে তাঁর পুত্র বেদবিদ্যা আয়ত্ব করেছেন বটে—কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী অহঙ্কারী ও অবিনীত হয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়নি তার।

ঋষি উদ্দালক তাই মর্মাহত হয়েই পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তোমার গুরুকে সেই আদেশের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে বৎস?

: কি আদেশ পিতা?

: যে আদেশের দ্বারা অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায়, অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, অশ্রুত বিষয় শোনা যায়!

শ্বেতকেতু তাঁর পিতার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে তিনি নিজেকে জাহির করেছেন, তিনি তো অশ্রুত বিষয় শোনেননি, অবিজ্ঞাত বিষয় জানেন নি, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করেন নি।

অবাক হয়েই তিনি তার পিতাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: এরূপ আদেশ কিরূপে সম্ভব পিতা?

: সম্ভব। একখণ্ড সোনাকে জানলে—যেমন সোনার তৈরী সকল জিনিসকে জানা যায়, একখণ্ড মাটিকে জানলে—মাটির তৈরী

সকল কিছুকে জানা যায়—তুমি কি তেমন এক বা অদ্বিতীয়ের কথা জানোনি—যাকে জানলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুকে জানা যায় ?

শ্বেতকেতু অবাক হ'লেন। চিন্তিত হ'লেন। গুরুগৃহে তিনি দীর্ঘ বারো বৎসর অতিবাহিত করেছেন বটে—কিন্তু আসল তথ্যই যে তাঁর জানা হয়নি। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঐ এক এবং অদ্বিতীয়কে না জানতে পারলে—চার বেদ ও ছয় বেদান্ত পাঠ, সবই তুচ্ছ। আসলে তিনি কিছুই শেখেন নি। পিতার কথা শুনে—তার শিক্ষাভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

তিনি বিনীত ভাবে বললেনঃ আমার উপাধ্যায়গণ—এসব কথা আমাকে বলেন নি। তাঁরা যদি জানতেন—নিশ্চয়ই আমাকে বলতেন। আপনি দয়া পরবশ হয়ে—আমাকে সেই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিন পিতা !

পুত্রের বিনীত ভাব দেখে ঋষি উদ্দালক সন্তুষ্ট হলেন, তিনি একে একে পুত্রের কাছে পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেনঃ পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এক, আবার স্বীয় ইচ্ছা ক্রমেই বহু বহু রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি নিরাকার, আবার স্বেচ্ছায় সাকার। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বশক্তিমান।

তারপর ঋষি উদ্দালক পর্য্যায়ক্রমে তেজ, সলিল, পৃথিবী, মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টির কথা ব্যাখ্যা করলেন। এবং বললেন কি ভাবে সেই পরম পুরুষ নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে আত্মা হয়ে জীবজগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন! ঋষি উদ্দালক বললেন, সেই অচিন্ত্যনীয় এক পরম পুরুষের থেকেই আমাদের মন, প্রাণ, বাক্য ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সেই এককে জানলেই সকলকে জানা যায়। এইতো পরম আদেশ। আত্মাই সত্য, আত্মাই পরমব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে জানেন—তিনিই ব্রহ্মিষ্ঠ। সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ ভাবে জানাই উপনিষদের

প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদের যে অংশ দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মকে পরি পূর্ণভাবে জানা যায়—আত্মা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়—তাইতো উপনিষদ। বেদের শেষ থেকেই উপনিষদের সুরু। উপনিষদই বেদের শেষ ভাগ বা অন্তভাগ—চরম ও পরম জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ তাই উপনিষদেই।

গ্রন্থ পাঠ করে তাঁকে জানা যায় না, বেদ পাঠ করেও তাঁকে জানা যায় না—সেই পরম করুণাময়ের করুণা বা কৃপা না হ'লে তাঁকে জানা যায় না। তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। তাঁর করুণা পেতে হ'লে দীন হতে হবে, বিনীত হ'তে হবে।—অন্তরে অসীম আকুলতাও থাকা চাই বৈকী! তাঁর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা চাই।

এই প্রসঙ্গে আমি নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান উল্লেখ করতে চাই। নিছক উপাখ্যান থেকেও পাঠক-পাঠিকারা চরম ও পরম সত্য সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারেন।

ঋষি বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যথাসর্বস্ব দান করার নিয়ম—যথাসর্বস্ব দানেই সুফল লাভ হয়ে থাকে এই যজ্ঞে।

এই যজ্ঞে মুনি-ঋষিরা তৃপ্ত হন্, তৃপ্ত হন্ স্বর্গের দেবতারা। ত্রিভুবনের সকল জীবজন্তু তৃপ্তি লাভ করে এই মহাযজ্ঞের ফল প্রভাবে।

যজ্ঞ প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। ঋষি বাজশ্রবস তাঁর সকল সম্পত্তি দান করলেন, এবং দক্ষিণা হিসাবে এক পাল গরু দান করবেন বলে—সেই গরুর পালকে যজ্ঞস্থলীতে আনয়ন করলেন। কিন্তু গরুগুলো অত্যন্ত রুগ্ন, বলতে গেলে মৃতপ্রায়।

যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সকলেই যখন সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না ঋষি বাজশ্রবসের শিশুপুত্র নচিকেতা। তাঁর মতে ঐ রুগ্ন ও অকর্মণ্য গরুর পাল পুরোহিতদের দক্ষিণা হিসাবে দান করা অনুচিত।

নচিকেতা পিতার অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, যদি স্বীয় আত্মদান করেও পিতার যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেরূপই একটা কিছু করবেন।

তিনি বারবার পিতাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন: পিতা আপনি তো আপনার যথা সর্বস্বই দান করলেন—কিন্তু আমাকে কাকে দান করলেন?

প্রথম দু'তিন বাব জিজ্ঞাসিত হয়েও ঋষি বাজশ্রবস পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াব প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি। পুত্রকে দান করার কোন ইচ্ছাই ছিলনা তাঁর। কিন্তু বারবার পুত্র একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়—ঋষি বাজশ্রবস বিরক্ত হয়ে বললেন, যাও—তোমায় আমি যমকে সম্প্রদান করলুম।

ঋষি পিতা, সত্যাশ্রয়ী। নচিকেতা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমালয়ে যাবেন বলেই ঠিক করলেন।

পুত্রকে যমকে দান করার কথা কিন্তু বাজশ্রবস স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। রাগের মাথায় পুত্রের উপর বিরক্ত হয়েই তিনি বলে ফেলেছিলেন কথাটা। ওটা তাঁর মনের কথা নয়। কোন পিতারই মনের কথা—এধরণের নির্মম ও নিষ্ঠুর হ'তে পারে না।

নচিকেতা কিন্তু পিতৃসত্য পালনের জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি পিতার কাছে বিদায় চাইলেন।

: আপনি যখন আমাকে যমকেই দান করেছেন। তখন আমি যমালয়ে চলে যাচ্ছি। নচিকেতা বললেন।

: আমি বিরক্ত হয়ে হঠাৎ ফস্ করে ঐ নিদারুণ কথাটা বলে ফেলেছি। ওটা আমার মনের কথা নয়। তুমি তোমার কাজে যাও। ঋষি বাজশ্রবস বললেন।

কিন্তু পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সত্যাশ্রয়ী পিতা—সত্য থেকে বিচ্যুত হন—তা নচিকেতার কাম্য নয়।

পিতার সত্য রক্ষায় নচিকেতার দৃঢ়তা দেখে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও

ঋষি বাজশ্রবস্ পুত্রকে যমালয়ে পাঠাতে বাধ্য হ'লেন। ঋষি বাজশ্রবসের সর্বস্ব দানে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সার্থক হ'ল। নচিকেতা ইহলোক ত্যাগ করে যমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন কিন্তু ঋষি পিতার অন্তরে নেমে এল পুত্রশোকের হাহাকার। ঋষি হ'লেও বাজশ্রবস পিতা। পুত্রশোকে পিতার অন্তরে নিদারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি হওয়াইতো স্বাভাবিক।

যম। শব্দটি শুনে মনে হয় তিনি নিষ্ঠুর—দয়া-মায়াহীন, দণ্ডদাতা, কিন্তু যমের হৃদয়েও কুসুম কোমলতা বিদ্যমান। তিনি ক্ষমাশীলও বটেন।

তিনি নিয়ামক। তিনি প্রশাসক। কর্তব্য সম্পাদনের খাতিরেই তাঁকে দণ্ডদান করতে হয়,—কিন্তু তিনি মহিমাময় ও সুন্দর। মৃত্যু আছে বলেই তো জীবন এত সুন্দর। কর্মফলানুযায়ীই তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দণ্ড প্রদান করেন। তাই তিনি শুধু মৃত্যুরাজ নন—ধর্মরাজও। তিনি ধর্মকে ধারণ করে রয়েছেন। ইহলোক ও পরলোকের তিনিই সংযোগ রক্ষাকারী। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। তিনি মহান সচেতক।

নচিকেতা পিতৃসত্য পালনের জন্য যমলোকে গেছেন। তিনি যমলোকের অতিথি। কিন্তু তিনদিন তাঁকে যমলোকের দ্বারে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কারণ যমরাজ যমলোকে তখন উপস্থিত ছিলেন না। যমরাজের অনুপস্থিতিতে সূর্য্যের মতো তেজসম্পন্ন—ঋষিপুত্রকে যমলোকের কেউ অভ্যার্থনা জানাতে পর্য্যন্ত সাহস পাননি, পাছে ঋষিপুত্র ক্ষুণ্ণ হন এবং ক্ষুণ্ণ হয়ে অভিসম্পাত দিয়ে বসেন।

যম যমালয়ে ফিরে এসেই সকল কথা জানতে পেরে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অমিত তেজসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ শিশু তার অতিথি হয়েও তিনদিন উপবাসী।

যম নচিকেতাকে যথাযোগ্য সমাদর জানিয়ে, তার সন্তুষ্টি বিধানের মানসে তিনটি বর প্রদান করতে চাইলেন। ভাবলেন

ঋষিপুত্র বর লাভ করে সন্তুষ্ট হবেন, এবং অতিথি সংকারের ত্রুটি জনিত অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত হবে এতে।

নচিকেতা যমের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'লেন। নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না নচিকেতা।

তিনি প্রথম বর প্রার্থনা করলেন : আমার পিতার মনে প্রশান্তি আসুক, আমার জন্য তাঁর উদ্বেগ দূর হোক।

যম বললেন : তথাস্তু।

তারপর নচিকেতা দ্বিতীয় বর চাইলেন : স্বর্গলাভ করার জন্য মহান্ অগ্নির সেবা করে যে যজ্ঞ করতে হয়—আপনি সেই তত্ত্ব ও তথ্য কৃপা করে ব্যাখ্যা করুন। শুনেছি স্বর্গে দুঃখ, শোক, জরা ব্যাধি নেই।

ধরণীর মানুষের প্রতি পরম করুণা বশেই, নচিকেতা সকল মানুষের জন্যই স্বর্গলাভের উপায় জানতে চাইলেন। জানতে চাইলেন অগ্নির বিভিন্ন ব্যবহার।

নচিকেতার দ্বিতীয় বর প্রার্থনায় যম সন্তুষ্ট হ'লেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বিশদভাবে নচিকেতাকে বুঝিয়ে দিলেন—কি ভাবে অগ্নি চয়ন করতে হয়, বেদীমধ্যে সংরক্ষণ করতে হয়।

কারণ তৎকালে পৃথিবীর ঋষিগণ অগ্নির বিভিন্ন ব্যবহারের কথা জানতেন না, নচিকেতা তাই যমের কাছে অগ্নির বিভিন্ন ব্যবহারের কথা জেনে নিলেন।

যমরাজ নচিকেতার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : তুমিতো নিজের জন্য কিছু চাইলে না? আর একটি বর দিতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবার তোমার নিজের জন্য কিছু চাও।

নচিকেতা নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না! তিনি যমরাজকে বিনীত ভাবে বললেন, হে মহান্! আমার তৃতীয় প্রার্থনা হচ্ছে যে—আপনি আমাকে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত করান। মৃত্যুর পর আত্মা কিরূপে অবস্থান করেন। কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পর

আত্মাও লয় পায়—আবার কেউ বলেন আত্মা অবিনশ্বর। আপনি আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোকপাত ক'রে—আমার সংশয় অপনোদন করুন। আমার আর কোন প্রার্থনা নেই, এই আমার চরম ও পরম জিজ্ঞাসা।

নচিকেতার প্রার্থনা শুনে যমরাজ বিস্ময়ে হতবাক হ'লেন। কিছুই বললেন না প্রথমে। বালকের মুখে আত্মজিজ্ঞাসা। এই তো চরম ও পরম জিজ্ঞাসা। যুগযুগান্ত ধরে মানুষতো এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর চাইতে আর কোন বড় জিজ্ঞাসা নেই।

যম বললেন: তুমি অন্য কোন বর চাও। এযে বড় সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ তত্ত্ব জানার পর আর কিছু জানার বাকী থাকেনা। এমন দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তুমি জানতে চেয়ো না। তুমি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর, আমি প্রতিশ্রুতি মতো পূরণ করব। শত সহস্র অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের সুখলাভও যদি প্রার্থনা কর—আমি তোমাব সে প্রার্থনা পূরণ করব। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় এ তত্ত্ব জানতে চেয়োনা।

কোন প্রলোভনের দ্বারাই নচিকেতাকে টলাতে পারলেন না যমরাজ।

নচিকেতা ধীর অথচ শান্ত কণ্ঠে বললেন: প্রভু, ঐ একটি মাত্র জিজ্ঞাসা ছাড়া আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা নাই। ঐ একটি মাত্র প্রার্থনা ছাড়া আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। অনন্তকালের অনন্ত জিজ্ঞাসারই উত্তর চাই আমি।

যমরাজ নচিকেতাকে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করতে চাইলেন, কিন্তু নচিকেতা অচল ও অটল রইলেন।

পরিশেষে নিরুপায় হয়েই যমরাজ নচিকেতার কাছে সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ব্যাখ্যা করলেন। সর্ব বেদে যে পরম পদের কথা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মপদের কথাই বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন যমরাজ।

ঃ তিনি ওম্‌। তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই অসীম—তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি নিরাকার, তিনিই আবার স্বেচ্ছাক্রমে সাকার, তিনিই আনন্দ, তিনিই চিন্ময়। তাঁর শরীর লয় পেলেও —তাঁর লয় নেই। তিনিই অনন্ত, অব্যয়। তিনি শব্দ—স্পর্শ রূপের অতীত—আবার স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তিনিই বিভূ, তিনিই পরমাত্মা। তিনি বজ্রের সম কঠোর, আবার কুসুমের মতো কোমল। তিনি মহাভয় রূপে বজ্র উদ্যত করে রয়েছেন বলেই সূর্য্য কিরণ প্রদান করছে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করছেন। অথচ তিনি আবার অভয়। বাক্য, চক্ষু ও মন দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার স্বেচ্ছায় সাকার। তিনি আছেন—এই বিশ্বাসই শ্বাশ্বত সত্য। তিনি সকলের অন্তরে অন্তরে অন্তরতম হয়েই বিরাজমান। তিনি সকল জীব, এমনকি আমরা যাকে জড় পদার্থ বলে ভাবি—তার মধ্যেও অন্তরাত্মা রূপে বিদ্যমান। এই নিখিল বিশ্বচরাচর তাঁর দীপ্তিতেই উদ্ভাসিত। তিনিই শুদ্ধ, তিনিই অমৃত, তিনিই মহা জ্যোতির্ময় প্রাণপুরুষ! এই জ্যোতির্ময়কে উপলব্ধি করা সহজ নয়। আমাদের দেহ যেন রথ, তিনি আত্মারূপী রথী, বুদ্ধি সারথী, আমাদের মন যেন অশ্বের রশ্মি, আর ইন্দ্রিয় সমূহ যেন সেই রথের অশ্ব। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ। তিনিই আদি, তিনিই শেষ। তিনিই একমাত্র পুরুষ, তিনিই পরমপুরুষ। তিনিই পরমাগতি। তিনিই পুরাণ পুরুষ। তিনি অণুরও অণুতম। তিনি মহান, তিনি মহীয়ান। কেবলমাত্র তপস্যা করে তাঁকে পাওয়া যায় না, বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারাও তাঁকে জানা যায় না। যতক্ষণ না তিনি করুণা করছেন ততক্ষণ তাঁকে জানা সম্ভব নয়।

তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা যায় না। তাঁকে জানা সম্ভব নয়।

নচিকেতা ও যমের এই উপাখ্যানকে নিছক গল্প কথা ভেবে নিলেও—এই নিছক গল্পকথার মাধ্যমে এক পরম সত্য উদঘাটিত।

যিনি পূর্ণব্রহ্ম, নিরাকার, যিনি পরম পুরুষ—তিনি সর্বশক্তিমানও বটেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় আবার রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। তিনি আকার ধারণ করে সাকারও হ'তে পারেন। অতএব ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার এ ধরণের তর্ক বৃথা। তিনি সাকারও আবার নিরাকারও—তিনিই সব। তিনিই একমাত্র। তিনিই পরমাগতি।

জগতে বহু অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন : "সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!"

হে অর্জুন, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমারই শরণ লও, আমি এক, আমিই বহু, আমিই সব।

যাঁকে ব্রহ্মবাদীগণ নিরাকার, পূর্ণব্রহ্ম ও পরমাত্মা আখ্যা দেন, —যিনি এমন কি বাক্য, চক্ষু ও মনেরও গোচর নন—সেই তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে সাকার! শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই তাই পূর্ণব্রহ্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

আমরা কলিযুগের মানুষেরা ধন্য, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই যুগেই জীবের প্রতি অসীম মমত্ববোধে বিস্মৃত সেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে সহজ ভাবে প্রকাশ করেছেন। সেই যুগ-যুগান্তের অচিন্তিত, অবিজ্ঞাত ও অশ্রুতকেই—প্রকট রূপে প্রতীয়মান করেছেন।

বেদ সমুদয়ের সার গীতায়, গীতার সার ঐ একটি কথায় : হে অর্জুন—চিরাচরিত সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করে আমারই শরণ লও —আমিই সেই পরমপুরুষ।

কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও দ্বারকার কৃষ্ণের—মিলিত জীবন ও বাণীর মধ্যে তাই সেই অনন্ত ও অসীম সীমার মধ্যে প্রতিভাত! তাই কৃষ্ণলীলা এত মাধুর্য্যমণ্ডিত পরম রমণীয়!

স্বাভাবিকতার মধ্যে—অলৌকিক শক্তির অভিনব প্রকাশ। সীমার মধ্যে অসীম বোধ হয় এমন অনবদ্যভাবে আর কোথায়ও ধরা দেন নি।

যিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আবার অচ্যুতও বটেন। সাধারণ বৈয়াকরণিকরা 'অচ্যুত' শব্দটির ব্যাসবাক্য লিখবেন, 'অচ্যুতঃ যঃ সঃ—অচ্যুতঃ। কিন্তু ভক্তিবাদী বৈয়াকরণিকরা বলবেনঃ 'অচ্যুত' শব্দের ব্যাসবাক্য হচ্ছে—সর্বথা ভক্ত-হৃদয়াৎ চ্যুতি রহিত যঃ সঃ।" অর্থাৎ সেই তিনিই অচ্যুত—যিনি সর্বদা ভক্ত হৃদয় থেকে চ্যুতি রহিত। অর্থাৎ যিনি সর্বদা ভক্তহৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত—তিনিই অচ্যুত।

জ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের কাছে যিনি পূর্ণব্রহ্ম ও নিরাকার, বাক্, চক্ষু ও মনের দ্বারাও যাকে উপলব্ধি করা যায় না—সেই তিনিই আবার ভক্তিবাদীদের কাছে সহজেই ধরা দিয়ে বসে আছেন। শুধু ধরা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—সর্বদা ভক্ত-হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন।

ভক্তদের আনন্দ বর্ধনের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা। সমগ্র ব্রজ পরিমণ্ডলই কৃষ্ণময়। জাগতিক ধ্যান—ধারণা ও প্রেম বিষয়ক প্রচলিত ধারণা নিয়ে—শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একমাত্র যারা রাগানুরাগী ভজন পথের যাত্রী, তারাই শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের অধিকারী। অন্যেরা নয়। একমাত্র রাগানুরাগী ভজনকারীগণই শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের অধিকারী, কারণ তাদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নররূপে এই লীলার অবতারণা করেছেন।

আমরা আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণায় প্রেম বলতে যা বুঝি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীনীদের প্রেম কিন্তু—সেই একই পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

দুগ্ধপানও পান, আবার মদ্যপানও পান—এই দুই পানের মধ্যে তফাৎ অনেক।

আমাদের জাগতিক প্রেম কখনও পূর্ণতা আনে না, কারণ কাউকে ভালবেসে আমরা প্রতিদানে কিছু চাই—আত্মসুখের বাসনা থাকেই আমাদের। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিনীদের প্রেমের মধ্যে আত্মসুখের বাসনা নেই। আছে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্যই সর্বরকম আন্তরিক প্রচেষ্টা। দিয়েই আনন্দ সেখানে, পেয়ে নয়। পাওয়ার কথা নেই। নিজেকে প্রেমাস্পদের সম্প্রীতি সম্পাদনের জন্য পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েই সে আনন্দ!

অভাববোধ থাকলে—প্রেমে পূর্ণতা আসতে পারে না। তাই আমাদের জাগতিক প্রেম কখনই সার্থক হয় না। আমরা যখন পরস্পরকে ভালবাসি—পারস্পরিক অভাববোধের তাড়না আমাদের বিচলিত করে—প্রতিদানে কিছু না পেলে আমরা মর্মাহত হই। আমরা নিজেরাও পূর্ণ নই (জাগতিক মানুষের দৈহিক ও মানসিক অভাব বোধ—এক চিরন্তন সত্য), যাকে ভালবাসি তিনিও পূর্ণ নন, অতএব আমাদের জাগতিক প্রেম পূর্ণতা আনতে পারে না,—অভাব বোধও দূর করতে পারি না আমরা। তাই আমরা যাকে সচরাচর প্রেম আখ্যা দিই—তা নিছক প্রেম-প্রেম খেলা মাত্র।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিনীদের প্রেমে কোথায়ও আত্মসুখের কামনা নেই। কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখের কামনাই তাদের প্রেমকে মহিমামণ্ডিত করেছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও পূর্ণ—ব্রজগোপিনীরাও পূর্ণ, তাদের প্রেমে ব্যক্তিগত অভাববোধের তাড়না নেই।

তাই বৈষ্ণবগণ বলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

চণ্ডীদাস ও রজকিনীর প্রেম ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিছক প্রেমই ছিল (সে প্রেমেও পরিপূর্ণতা ছিল না) যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রেম ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তরিত না হয়েছিল।

'শতেক বরষ পরে, বধুয়া ফিরল ঘরে, শ্রীরাধিকার মনেতে উল্লাস।'

শতেক বছর পরে বধূয়া ফিরে এলে—একমাত্র শ্রীরাধিকার মনেতেই উল্লাস জাগা স্বাভাবিক—কারণ শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে কোন আত্মসুখের বাসনা ছিল না।

ঐ অবস্থায় শত বছর পরে কারো প্রেমাস্পদ ফিরে এলে, জগতের অন্য কোন নায়িকার মনেই উল্লাস জাগা সম্ভব নয়—বরং ঐ অবস্থায় জাগতিক নায়িকা প্রেমাস্পদকে সম্মার্জনী দ্বারাই বিতাড়ন করতেন। এবং সেটাই স্বাভাবিক হ'তো।

অতএব জাগতিক বোধের মানদণ্ডে ব্রজগোপিনীদের কৃষ্ণ প্রেমের মূল্যায়ন অনুচিত।

মীরাজীও বলেছেন ঃ 'বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।'

সে প্রেম অভাববোধহীন আন্তরিক প্রেম!

আমাদের জাগতিক প্রেম অভাববোধ ও প্রতিদান-কামনা যুক্ত, —তাই আমাদের প্রেমে পূর্ণতা নেই। চরম আনন্দ নেই।

শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীকে এঁটো আম খাওয়াতেন। আমরা সাধারণ লোকেরা মহাপাপের ভয়ে—নিশ্চয়ই মা-কালীকে এঁটো আম খাওয়াতে ভরসা পেতুম না! কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস মা-কালীকে আন্তরিক ভাবেই ভালোবাসতেন। তাঁর ধ্যান ধারণা তাই ছিল স্বতন্ত্র!

'আমি মাকে আম চেখে খাওয়াব। আম টক কি মিষ্টি চেখে দেখব না একবার। আমি নরকে যাই—সেও ভালো, কিন্তু মা-বেটীকে কিছুতেই আমি টক আম খাওয়াব না।'

এই ধরণের আন্তরিক ভালবাসার ফলেই শক্তি-স্বরূপা মহামায়া—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধরা আর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারেন নি। ধরা না দিয়ে তাঁর আর কোন উপায় ছিল না।

তাই বলছিলাম, শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের সকলেই অধিকারী নন। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের কারা যথার্থ অধিকারী—পরবর্তী পর্য্যায়ে নিশ্চয়ই বিশদভাবে আলোচনা করব।

আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণা—প্রেমবিষয়ক প্রচলিত ধারণা নিয়ে—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা শ্রবণে আমরা আনন্দতো পাবোই না—বরং জাগতিক মানদণ্ডের বিচারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

তাই একটা কথা বলে রাখি-যথার্থই যোগ্য না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ পুণ্যের তো নয়ই, বরং পাপের। সাধারণ ধারণার মাপকাঠিতে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা লম্পট-চূড়ামণি বলেই ভেবে নেবো! কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে তাই?

সমগ্র ব্রজ-পরিমণ্ডলই যে কৃষ্ণময়। আয়ানও কৃষ্ণ, শ্রীরাধাও কৃষ্ণ, সখীরাও কৃষ্ণ, সখাগণও কৃষ্ণ—অতএব এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে লাম্পট্য দোষে অপরাধী করার অবকাশ কোথায়? একমাত্র পরম পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ—লীলায় অংশ গ্রহণকারী—আর সকলেই যে তাঁরই প্রতিচ্ছবি। ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই তো তাঁর বৃন্দাবন লীলা। তিনি নিজেকে তাই বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে—আপন মাধুর্য্যকে ভক্তদের কাছে তুলে ধরেছেন।

এ তত্ত্ব যাদের জানা নেই, লীলারস আস্বাদনের তাদের কোন অধিকার নেই। রাসলীলা শ্রবণ করে—অযোগ্য ব্যক্তিদের মনে জাগতিক কামবিষয়ক চিন্তাধারা প্রকট হয়ে উঠবে মাত্র! পুণ্যলাভ হবে না।

রসভাণ্ড তাই উজাড় করে দিতে নেই—অধিকারী-অনধিকারী ভেদ থাকে, একেবারে উজাড় করে দিলে মাছি পড়বার ভয় থাকে। যে রস প্রাণদায়িনী অমৃত-স্বরূপা, সেই রসই আবার বিষাক্ত বলে প্রতিভাত হয়। উন্মুক্ত থাকার ফলে প্রাণঘাতিনীও হ'তে পারে।

ঈশ্বরতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্ব সঠিকরূপে জানা সহজ নয়—বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই এ তত্ত্ব জানা সম্ভব।

তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কৃপা পেতে হ'লে জীবে দয়া, নামে রুচি এবং তৃণের মতো দীন এবং তরুর

মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে। চাই সাধু সঙ্গ—আর সর্বোপরি তাঁকে জানার জন্য চাই আন্তরিক আকুলতা।

তাঁর কৃপা ভক্তজনের মাধ্যমেও ঝরে পড়তে পারে। কারণ তিনি অচ্যুত, ভক্ত হৃদয় থেকে চ্যুতিরহিত।

তাই ভক্তজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া দরকার। ভক্তজনের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। কে ভণ্ড, কেবা প্রকৃতভক্ত বোঝা যেখানে মুশকিল—সেক্ষেত্রেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

আর কৃপা ধারণের জন্য—দেহ ও মনের পাত্র উপযুক্ত করে রাখা দরকার, নতুবা কৃপা পেয়েও লাভ হবে না, তেমন লোভ ও মোহের অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত পথ দিয়ে সে কৃপা বাইরে বেরিয়ে যাবে। তীরে এসেও তরী ডুবে যাবে। অমৃতভাণ্ড হস্তে ধারণ করেও—অমৃতের স্বাদ পাওয়া যাবে না।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ—প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

—চৈঃ চঃ ১৯।১৫১।

ভক্তিলতা বীজ মানে শ্রদ্ধা। সাধু গুরু সঙ্গ বিনা ঈশ্বরে শ্রদ্ধালাভ হয় না। ভগবান অচ্যুত, ভক্তহৃদয়ের সাথে সংযুক্ত। শ্রীসাধুসঙ্গে শ্রদ্ধালাভ হয়, শ্রদ্ধা থেকেই রতি—এবং রতি থেকেই প্রেমভক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন ঃ—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

*   *   *

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয়—শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥

অনর্থ—নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ভক্তি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্বানন্দধাম॥

—চৈঃ চঃ ২২ ও ২৩ পঃ।

অতএব প্রেমবিষয়ক আমাদের জাগতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে, ...র কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

কৃষ্ণপ্রেম বা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বা প্রেমভক্তি পূর্ণতা আনে, অভাববোধকে বিদূরিত করে, চিত্ত শুদ্ধ হয়—কামনা বাসনা যুক্ত জাগতিক প্রেম আমাদের অভাববোধকেই তীব্রতর করে। প্রতিদানে কিছু না পেলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই মর্মাহত হই।

আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছা তাই কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। এই প্রেমভক্তিই ঈশ্বরকে নিকটে টেনে আনে। অব্যক্ত, অব্যয় পরমপুরুষ—ভক্তজনের কাছে প্রেমভক্তির প্রভাবেই ধরা দিতে বাধ্য হন্।

বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করে গ্রন্থ-কীট হওয়া যায়, সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ে সাধারণ জ্ঞানও লাভ করা যায়, কিন্তু পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপা না পেলে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না। সব পড়া, সব জানা বৃথা হয়ে যায়!

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নব-যোগীন্দ্রের বর্ণনায় একটি সুন্দর শ্লোক রয়েছে—

মানুষো দেহ দুর্ল্লভঃ, দেহীণাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥

আমরা হিন্দু, আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানগণও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। কীট-পতঙ্গ বা অন্যান্য

পশুপাখি অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ! মানুষ চিন্তা করতে পারে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে। মানুষ আপন মেরুদণ্ডের ওপর নির্ভর করে উঁচুতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। যাঁরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নন, তারাও স্বীকার করেন—অন্য সকল প্রাণীদের অপেক্ষা মানুষই শ্রেষ্ঠ। আজকের এই পৃথিবীতে তাই মানুষেরই প্রভুত্ব। মানুষের চেয়েও বলশালী পশুরাও তাই মানুষেরই দয়ার ওপর আজ নির্ভরশীল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুদের স্থান আজ তাই শহরের কোন চিড়িয়াখানায় অথবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। তারা সকলেই মানুষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

তাই অনায়াসেই বলা যায়—দেহধারী জীবজন্তু ইত্যাদির মধ্যে মনুষ্যদেহ লাভ করা দুর্লভ। তাইতো আমাদের দেশের বাউলদের মুখে গান শোনা যায়ঃ

এমন মানব জনম রইল পতিত।
আবাদ করলে ফলত সোনা।

কিন্তু মানুষ হয়েও আমরা ভোগসুখ লাভের জন্য সর্বদা ব্যস্ত। মানুষের ভোগসুখ ধারাকে আরও উন্নত করার জন্যই—কতশত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। জীবন ধারণের মান উন্নত করার জন্য কত বইপত্র, কত আবিষ্কার—কত কত নূতন নূতন ধারণা—ক্লান্তিকর কতো প্রচেষ্টা।

আমাদের আরাম আয়াসের ব্যবস্থা করবার কত নূতন নূতন ব্যবস্থা। তবু কি আমরা পরিপূর্ণ সুখী হ'তে পেরেছি? জাগতিক ভোগসুখের সব কিছু হাতের কাছে পেয়েও কি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি—আমাদের আর কিছু চাওয়ার নেই! আমাদের আর কোন অভাব বোধ নেই! আমরা পরিতৃপ্ত! আমরা পরিপূর্ণ!

কিন্তু আমরা ভোগসুখের যত উপকরণ হাতের কাছে পাচ্ছি, ততই আমাদের অভাববোধ যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। আরো চাই!

আরো চাই! কিন্তু সত্যিকারের কি কি জিনিস পেলে আমরা পরিতৃপ্ত হবো, আমরা কি তা কেউ জানি? আমরা কি কেউ বলতে পারি—একমাত্র এই জিনিসটা পেলে 'আমি আর কিছু চাইব না।' আমার কিছু চাওয়ার থাকবে না।

পারি না! কেন জানেন? আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা জানি না। জানি না আমরা কে? কোত্থেকেই বা এসেছি? কোথায়ই বা যাব? পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে কেনই বা আমাদের বারবার এই যাতায়াত? কেন আমাদের এত অভাববোধ? জাগতিক সুখ-সম্ভোগের সব কিছু উপকরণ পেয়েও আমরা কেন পরিতৃপ্ত নই? আমরা কেউ বলতে পারি না—আমি পরিতৃপ্ত। আমি পরিপূর্ণ! আর কিছু চাই না আমি!

আমরা সকলেই 'আমি' 'আমি' করি বটে, কিন্তু দেহের কোথায় যে সেই 'আমি'—তাঁর খোঁজ পাই না।

দেহ থেকে হাতটা বিচ্ছিন্ন করুন, পাটা বিচ্ছিন্ন করুন,—একে একে সব কিছুকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখুন না—কোথায়ও সেই আমিত্ব নেই। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে—খোসা ছাড়ানোই সার হবে। তেমনি দেহের কোন অংশের মধ্যেই আসল আমিত্বের খোঁজ পাওয়া যাবে না। খুঁজে খুঁজেই হয়রান হয়ে যেতে হবে। অন্ধকারে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মরতে হবে কেবল—আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। আলোর সন্ধান পেতে হ'লে—দেহাতীত লোকে যেতে হবে। সীমার মধ্যে থেকে অসীমের সন্ধান করতে হবে। সীমার মধ্যে অসীমেরই খোঁজ পাওয়া যাবে—যদি দেখার মতো চোখ থাকে। শুধু চোখ থাকলেই হবে না, অসীমের যিনি সন্ধান পেয়েছেন, সান্নিধ্য লাভ করেছেন—তাঁর কৃপা লাভ করতে হবে।

আমরা নিজেদের সঠিক পরিচয় জানি না। ঈশ্বরকেও চিনি না। তাই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করেও—জীববৃত্তির তাড়না আমাদের আপাতঃ সুখের দিকে টেনে নিয়ে যায় কেবল।

কয়েকখানা বই পড়েই আমরা বিদ্যা জাহির করি। এক ফুঁয়ে ভগবানকে উড়িয়ে দিই। ভগবান বলে কিছু নেই! ঈশ্বর বলে কিছু নেই! আমরাই সব! যে-ব্যক্তি কখনও লণ্ডনে যায়নি, সে যদি লণ্ডনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে—তাতে লণ্ডনের কি যায় আসে? যারা লণ্ডনে গিয়েছেন, লণ্ডন দেখেছেন—অবিশ্বাসীরা কি তাদের বিশ্বাসকে টলিয়ে দিতে পারে?

একটা ছোট খাট অটোমেটিক (স্বয়ংক্রিয়) কারখানা চালাবার জন্য যদি একজন সুপারভাইজার দরকার হয়, একজন যন্ত্রীর দরকার হয়। —বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একমত হয়েও বলা যায়, এই বিশ্ব চরাচরকে যদি একটা স্বয়ংক্রিয় কারখানা বলে ভেবে নিই—তবেও কি ভগবানের অস্তিত্বকে এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি?

একটা ছোটখাটো স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) যন্ত্রপাতির কারখানার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণের যদি একজন মানুষ পর্য্যবেক্ষকের দরকার হয়—তবে এই বিশ্ব চরাচরব্যাপী সৃষ্টি পালন-পোষণ ও ধ্বংসের যে বিরাট স্বংয়ক্রিয় কারখানা রয়েছে—তারও যে একজন পর্য্যবেক্ষক নেই, একথা জোর গলায় বলা চলে কী?

মানুষ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পূর্ণ রকেট শুক্রগ্রহে পাঠাচ্ছে, কিন্তু গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল থেকেই তার কার্য্যধারাকে কতগুলি মানুষ আবার নিয়ন্ত্রিত করছে। অতএব এই বিশ্বচরাচরকে বা প্রকৃতিকে যদি একটি স্বয়ংক্রিয় কারখানা বলেও ভেবে নিই—তাহলে এই বিরাট কারখানার কার্যধারাকে নিয়ন্ত্রণ বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে একজন সুপারভাইজার বা যন্ত্রী নেই—এই কথাটা অস্বীকার করি কি করে? বিশ্ব-নিয়ন্তা বলে একজন কেউ রয়েছেন, একথা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয়। হয়তো আমরা তাকে আমাদের চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারছি না। আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছি না—তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি কি?

বিজ্ঞানীরাও বলেন—একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিই আসল। আমরা সেই শক্তিকেই ভগবান বলি। দেখার মতো চোখ বা জ্ঞান না থাকার ফলে হয়তো আমরা সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, অনুভব করতে পারছি না, তাই বলে সেই শক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না।

বিজ্ঞান যাকে শক্তি বলে। আমরা তাকে বলি ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই বিশ্ব-নিয়ন্তা। সর্বশক্তির আধার।

বিদ্যুৎ শক্তিতো খালি চোখে দেখা যায় না—কিন্তু সেই শক্তিতে ট্রাম চলে, ট্রেন চলে—আবার বাতি জ্বলে। আমরা বাতির মধ্যে সেই শক্তিকে আলো রূপে দেখতে পাই।

তেমনি ঈশ্বরও আছেন, সর্বত্র আছেন, আমাদের দেখার মতো চোখ নেই বলেই তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

বিজ্ঞান যাকে শক্তি আখ্যা দেয়—সেই মূল শক্তি যদি সম্পূর্ণ চেতন না হয়—এই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টির ধারা এমন সুন্দর, এমন নিখুঁত হতে পারত না। ঠিক যেখানে যা প্রয়োজন, সে'টি সেখানে। চোখ যেখানে থাকা দরকার, ঠিক সেখানে। নাক যেখানে থাকা দরকার ঠিক সেখানে। একবার ভেবে দেখুনতো জীবজন্তু বা মানুষের যদি চোখ না থাকত—তবে কি হোত? বিজ্ঞান যাকে শক্তি আখ্যা দেয়—সেই শক্তি কোন সাধারণ শক্তি নয়, অচেতনও নয়—তাঁর Calculating brain রয়েছে। যেখানে যা থাকা দরকার তিনি সে ভাবেই অর্থাৎ নিঁখুতভাবে তা' স্থাপন করেছেন। সৃষ্টিধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিপালন করছেন। ধ্বংসের পর আবার নূতনতর সৃষ্টি করছেন।

অতএব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোন বিতর্কে না এসে ও বলা যায়—ঈশ্বর আছেন, এবং তিনিই বিশ্ব-নিয়ন্তা। সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান যদি না থাকতেন; সৃষ্টি এত সুন্দর ও বৈচিত্রময় হ'তে পারত না। অনেকে বলেন ক্রম বিবর্তনের ফলে—সৃষ্টির এই সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য।

এতে ভগবানের কোন হাত নেই। ক্রম বিবর্তনের ফলেই যে সৃষ্টি সুন্দর বা নিখুঁত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা কোথায়?

কিন্তু সৃষ্টির অন্তরালের পরম পুরুষ যদি জড় পদার্থই হবেন—সৃষ্টির মধ্যে এমন বৈচিত্র্যবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধ থাকতে পারত কি?

আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারি বা না পারি, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি বা না পারি—তিনি আছেন।

কোলকাতায় থেকে কেউ যদি বলেন, কাশী বলে কোন জায়গা নেই—যেহেতু তিনি কোলকাতায় বসে কাশীকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না—তাতে কাশীর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই একথা প্রমাণ হয় না। কেউ যদি কাশীতে না গিয়ে বলেন, কাশী থেকে ঘুরে এসেছেন—তাহলে তিনি নিজেকেতো প্রতারিত করলেনই, অপরকেও প্রতারিত করলেন। তেমনি কেউ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ না করেও যখন কেউ বলেন তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করে থাকেন। ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের আনন্দ তিনি পান না।

অনেকে বলেন যা আমরা প্রত্যক্ষ করি না, তার অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য। তারা চার্বাকের মতই অনুসরণ করে থাকেন। ঋণ করে ঘি খেয়ে—সারাটা জীবন সুখে কাটাবারই চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু সুখে কাটাবার চেষ্টা করলেই কি সুখলাভ করা যায়? আর তা ছাড়া আমরা যা প্রত্যক্ষ করি না, তেমন সত্যকেও তো আমাদের সত্য বলে মেনে নিতে হয়। অনেকেতো তার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেন নি, তাই বলে তার প্রপিতামহ ছিলেন না, একথা তো বলা যায় না।

লণ্ডন বা কাশী কেউ যদি না দেখে থাকেন—তবে লণ্ডন বা কাশীর বাস্তব অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না।

ঈশ্বরতত্ত্ব জানিনা বলেই কি বলব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। ধর্মের প্রকৃত তথ্য না জেনেই কি বলব—ধর্ম আফিংয়ের নেশার মতোই

মানুষকে মোহাচ্ছন্ন:করে রাখে। কিন্তু ঐ মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলেই যদি চরম আনন্দ লাভ করা যায়, জাগতিক সুখ দুঃখকে তুচ্ছজ্ঞান করা যায়—তবে কেন আমরা ধর্মভাবাপন্ন হব না? আর আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাই যে সত্য সে কথা কি করে বলব, অনেক ক্ষেত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রম হ'তে পারে।

চরম সঙ্কটের আবর্তে অনেক নাস্তিক ব্যক্তিও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন। 'ভগবান, আমাকে বাঁচাও, আমার ছেলের প্রাণরক্ষা কর, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর—ইত্যাদি ইত্যাদি বলে আকুল আবেদন জানান।

যারা আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসও করেন, তারা আবার ঈশ্বরের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে ভরসা রাখতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে আশা করেন অনেক কিছু।

এক ভদ্রলোক তো আমায় সেদিন কথায় কথায় বলেই ফেললেন: বুঝলেন মশাই, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আর যদি থেকেও থাকেন—তিনি বোবা, কালা, অন্ধ।

বুঝতে পারলুম তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও, কোন কারণে ঈশ্বরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাই বাধ্য হয়ে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম: কেন বলুনতো? ঈশ্বরকে বোবা, কালা বা অন্ধ বলছেন কেন?

ভদ্রলোক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন: আমি দীক্ষা নিয়েছি। রোজ দু'বেলা ঠাকুর পূজো করি। মাঝে মাঝে ঠাকুরের ফটোর সামনে বসে আকুল হয়ে কাঁদি। কিন্তু আমার অভাব ঘুচল কই? সংসারে আর্থিক অনটন। তেল আনতে নুন ফুরোয়। একটা ছেলে টি.বি-তে ভুগছে। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারছি না। আর দু'টো ছেলে বি. এ. পাশ করে বেকার অবস্থায় ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজ যে ভগবানকে এত ডাকি, তিনি আমার দিকে তাকালেন কই? অথচ আমার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক

সুখে আছেন। মহা নাস্তিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। বড় বড় গাড়ী হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ান। নাস্তিক হয়েও দিব্যি সুখে রয়েছেন তিনি। এমন বোবা—কালা—অন্ধ ঈশ্বরকে ডেকে কি লাভ হবে মশাই?

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মধ্যেও দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসেছিল। ঈশ্বর তবে কি সত্যিই বোবা, কালা বা অন্ধ? তিনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না, কিছুই দেখতে পান না। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যে অন্যায় অবিচার ঘটছে—তিনি কি এসব ব্যাপারের কোন খোঁজই রাখেন না। তবে তেমন বোবা—কালা—অন্ধ ঈশ্বরকে ডেকে কি লাভ? ভাবলুম ভদ্রলোককে বলব—ভগবানকে ডেকে যখন কোন লাভই হচ্ছে না—তখন ডাকাডাকি না করলেই পারেন। অযথা ভগবানকে ডেকে সময় নষ্ট করার দরকার কি?

আমার পাশেই আর এক ভদ্রলোক (পার্কের বেঞ্চিতে) বসেছিলেন, তিনিও হেসে উক্ত ভদ্রলোককে বললেন: টাকার জন্য ভগবানকে ডেকে কোন লাভ নেই। আমি আমার আর্থিক অনটন দূর করার জন্য দশ বছর ধরে ভগবানকে ডাকছি,—কিন্তু আমার আর্থিক অভাব দূর হ'ল কই? এর চেয়ে দশ বছর ধরে যদি কোন কোটীপতি ঝুনঝুনওয়ালার সেবা করতুম—তবে তার কৃপায় দু-এক লাখ টাকা অবশ্যই পেতুম। ভগবানকে ডেকে কোন লাভ নেই মশাই। তাই আমি জপ-তপ ছেড়ে দিয়েছি। রিটায়ার করার পর পার্কে বসে তাস—দাবা খেলি। ভগবানকে ডেকে অযথা সময় নষ্ট করে কোন লাভ হয় না।

দু'ভদ্রলোকের মুখ থেকে দু'রকম কথা শুনে—আমারও ভগবানের ওপর বিরাগ জেগে উঠল। তাইতো। এমন বোবা—কালা—অন্ধ ভগবানকে ডেকে কি লাভ? ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলুম আমি।

বেঞ্চিতে আরও একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনিও আমার

মতো দীর্ঘক্ষণ চুপ্‌চাপ বসেছিলেন। উক্ত দু'জন ভদ্রলোকের মুখে ভগবান সম্বন্ধে মন্তব্য শুনে—তিনি আগেভাগে কোন কথাই বলেন নি। আমি প্রায় ভেবেই রেখেছিলুম, তিনিও ভগবানের আচরণ সম্বন্ধে হয়তো বা নূতন কোন অভিযোগ উত্থাপন করবেন। অথবা ভগবানের অস্তিত্বকেই এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু তিনি কোন অভিযোগ দায়ের করলেন না, শান্তভাবেই প্রথমোক্ত ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা বলুনতো—আপনার ছেলের যদি পেটের অসুখ হয়—তবে কি আপনি আপনার ছেলেকে তোলভাজা বা আজে বাজে কোন বাসি জিনিস খাওয়াবেন? ছেলে যদি ঐ অবস্থায় তেলেভাজা বা আজে বাজে কিছু খাওয়ার জন্য আবদার ধরে, তখনও আপনি আপনার ছেলেকে আজে বাজে কিছু খাওয়াবেন না নিশ্চয়ই?

প্রথমোক্ত ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন শুনে বললেনঃ বটেই তো।

ঃ ছেলে আবদার ধরলেও—কেন আপনি ছেলেকে ওসব দেবেন না বলুনতো?

ঃ কারণ ছেলেকে আমি ভালবাসি বলেই, আজে বাজে কিছু দিয়ে তার পেটের অসুখ বাড়িয়ে তুলতে চাই না।

সেই রহস্যজনক ভদ্রলোক শান্তকণ্ঠে বললেনঃ ভগবানও ঠিক তেমনি আপনাকে ভালবাসেন বলেই—আপনি অসুস্থ অবস্থায় আজে বাজে কিছু পাওয়ার জন্য নানা ভাবে আবদার ধরলেও, আপনাকে তা দিচ্ছেন না। আর আপনার প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোককে ভগবান ভালবাসেন না বলেই—তিনি আজে বাজে যা কিঁছু চাইছেন—দু'হাত ভরে তাই তুলে দিচ্ছেন। ভগবান বোবা-কালা-অন্ধ নন,—তাঁকে আকুল হয়ে ডাকুন। তিনি আপনাকে হয়তো এমন কিছু দেবেন—যার কাছে জাগতিক সকল সুখের উপকরণই তুচ্ছ হয়ে যাবে। তাঁকে ভুল বুঝবেন না। তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করুন।

কথাগুলো বলে সেই রহস্যজনক ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপেই দূরে চলে গেলেন। আর কোন প্রশ্ন করবার অবকাশও দিলেন না কাউকে। সেই রহস্যজনক ভদ্রলোকের কথা শুনে—আমার মনের সন্দেহের মেঘ দূরে মিলিয়ে গেল, আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে এক নূতন আলো দেখতে পেলুম। ভগবানকে তা'হলে আর বোবা-কালা-অন্ধ বলা যায় না তো?

তিনি সব কিছু দেখেন। সব কিছু বোঝেন। তাঁর দরবারে ন্যায় বিচার বিদ্যমান, ফাঁকিবাজী নেই। আমরাই বরং ভগবানকে ধাপ্পা দিতে গিয়ে—নিজেরাই উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াই।

মানব জনম দুর্লভ। অনেক ভাগ্যের ফলেই মানব জন্ম লাভ হয়। কিন্তু এমন দুর্লভ জন্ম লাভ করেও—আমরা অজ্ঞতার ফলেই এমন দুর্লভ জন্মকেও সত্যিকারের কোন কাজে লাগাতে পারি না। যে জমি আবাদ করলে সোনা ফলানো যেতো, অনাবাদী রেখে আমরা সেই জমিকে আগাছাতে ভরে তুলি। অথবা ধইন্‌চাই বুনে যাই কেবল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—

কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ভাগবতঃ ধর্মান্।

কিশোর বয়স থেকে ভগবানকে ডাকা উচিত। অর্থাৎ ঈশ্বর সাধনায় লিপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে দেহ যখন শিথিল, ইন্দ্রিয় সকল যখন আর ভোগের উপযুক্ত থাকে না, মৃত্যু যখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, তখনই আমরা পরলোকের কথা ভেবে জপতপে ব্রতী হই। উড়ো খৈ-কে গোবিন্দায় নমঃ করি। দেহ যখন জাগতিক সুখভোগে অসমর্থ হয়—তখনই আমরা ভগবানকে ডাকাডাকি করি। প্রতারণার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করে পরলোকের ব্যাপারে আখের গুছিয়ে নিতে চাই। ধাপ্পা দিতে চাই তাঁকে।

কিন্তু যিনি বিশ্ব-নিয়ন্তা তিনি তো আর মূর্খ নন, ফাঁকি দিয়ে শেষ বাজীমাৎ করার সকল প্রচেষ্টাই তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায়। আমাদের সব অপচেষ্টাই বান্‌চাল হয়ে যায়।

তাই ভক্ত প্রহ্লাদের মতো কিশোর বয়স থেকেই ঈশ্বরে অনুরক্ত হ'তে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করা যায় না, ঈশ্বর লাভ বা দর্শনতো স্বতন্ত্র ব্যাপার!

এ প্রসঙ্গে আমার একটি সংসারের এক পুত্রবধূ ও বয়স্কা শ্বাশুড়ীর কথা মনে পড়ছে। নবযৌবনা পুত্রবধূ রান্নাঘরে, রান্না করতে করতে কৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময়—অথচ বয়স্কা শ্বাশুড়ী ঠাকুর ঘরে বসে মালা জপ করলেও সব দিকেই তার খেয়াল বিদ্যমান। পুত্রবধূটি রান্না করতে করতেই তন্ময় হয়ে কৃষ্ণচিন্তা করছেন, ফলে উনোনে চড়ানো ডালের কড়াইয়ের ডাল পুড়ে গেল। পুত্রবধূটি কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর বলেই—রান্নাঘরে থেকেও ডাল-পোড়ার গন্ধ পেলেন না। অথচ শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণ—ঠাকুর ঘরে বসেই সে গন্ধ পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন: বউলো বউ, ডাইলটা যে ফ্যাতা ফ্যাতা হইয়া গেলো!

অতএব বৃদ্ধ বয়সে পরকালের আখের গুছোবার জন্য—ঈশ্বরের প্রতি প্রতারণামূলক আসক্তি মূল্যহীন; অতো সহজে ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ হয় না। ধাপ্পা দিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করা যায় না।

মনুষ্যদেহ দুর্লভ, এই দেহেই আবাদ করলে সোণা ফলানো যায়। এবং সময় থাকতেই আবাদ করতে হবে।

কিন্তু যা কিছুই দেহ ধারণ করে—তাই ক্ষণভঙ্গুর। মনুষ্যদেহ দুর্লভ নিশ্চয়ই—কিন্তু তদপেক্ষা দুর্লভ ঈশ্বরের প্রিয়জনের দর্শন লাভ।

'...তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্।

বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শন মানে ঈশ্বরের প্রিয়জন।

অনাদিকালের ভগবৎ বিস্মৃতির জন্যই—দুঃখ আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমরা জানিনা—আমরা কে? আমাদের প্রকৃত অভাববোধ সম্বন্ধেও আমরা সঠিকভাবে অবহিত নই। তাই আমরা শুধু চাই। গাড়ী চাই, বাড়ী চাই, টাকা চাই, সুন্দরী বণিতা চাই—অথচ সব কিছু পেয়েও আমরা সুখী হই না। যত পাই, তত চাই—আমাদের চাওয়ার বিরাম নাই। কেন এমন হয়? আসলে আমরা

যে কি চাই—তাই আমরা জানি না। আমরা নিজেদেরকে জানিনা বলেই কি পেলে আমাদের এই চিরন্তন অভাববোধ দূরীভূত হবে—তা সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই। মাটীর উঠোন থেকে খানিকটা মাটি উঠিয়ে নিলে—সেই গর্তকে মাটি দিয়ে পূরণ করতে হয়, অন্য কিছু দিয়ে সে গর্ত্ত ভরাট করলে বেমামান হবে। যথাযথ হবে না। ঠিক তেমনি আমাদের অভাববোধ যে কি—সে সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই বলেই—আমরা কোন কিছু দিয়েই সেই অভাববোধকে দূর করতে পারি না।

কারণ আমরা কেউ পূর্ণ নই। আমাদের অভাববোধকে দূর করতে হ'লে—সর্বাগ্রে আমাদের স্বীয় সত্বা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে।

ঈশ্বর যেন সূর্য্য, আমরা সূর্য্যের দিকে পেছন ফিরে সামনে তাকাচ্ছি—ফলে আমরা সূর্য্যকে দেখতে পাচ্ছি না—স্বীয় সত্বাকেও দেখতে পাচ্ছি না—দেখছি শুধু ছায়াটাকে। ঐ ছায়াকেই আমরা আপন সত্ত্বা ভেবে নিয়ে—ছায়ার সুখ দুঃখকেই আপন সুখ দুঃখ বলে ভেবে নিচ্ছি। আমরা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েছি এবং নিজেদের প্রকৃত সত্ত্বা সম্বন্ধেও অনবহিত, তাই দুঃখ এবং অভাববোধ আমাদের নিত্য-সঙ্গী। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় অথবা ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপায় আমাদের অজ্ঞতাজনিত চিরন্তন দুঃখ ও অভাববোধ বিদূরিত হ'তে পারে। একমাত্র পরম করুণাময়ের কৃপা প্রভাবেই আমরা তাঁকে জানতে পারি, এবং আমাদের প্রকৃত সত্বা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারি।

প্রকৃত ভক্তগণও কৃপা প্রভাবে আমাদের চিরন্তন দুঃখ বিদূরিত করতে পারেন। কারণ অচ্যুত ভগবান সর্বদা ভক্তহৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। (সর্বথা ভক্ত হৃদয়াৎ চ্যুতি রহিতঃ যঃ সঃ—অচ্যুতঃ)।

ঈশ্বররূপী সূর্য্য সম্বন্ধে একমাত্র ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রিয়জনই আমাদের অবহিত করতে পারেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যিনি অবহিত নন—তিনি কিরূপে আমাদের দুঃখ দূর করতে পারবেন ?

ঈশ্বররূপী সূর্য্যের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে—আমরা আমাদের ছায়াটাকেই আপন সত্ত্বা বলে ভাবছি। একমাত্র যিনি সূর্য্যকে দেখেছেন—তিনিই আমাদের ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে পারেন—ঐ দেখ সূর্য্যরূপী ঈশ্বর, আর এই তুমি। ঐ ছায়াটাতো আর তুমি নও! এবং ঈশ্বরও পরম করুণা বশে আমাদের সামনে হাজির হয়ে বলতে পারেন—এইতো আমি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধুসঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন, সাধু সেবা করতে বলেছেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ তো বটেই—কিন্তু তার চেয়ে দুর্লভ ঈশ্বরের প্রিয়জনের দর্শন লাভ করা। ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপা প্রভাবেই পরমপুরুষ ঈশ্বরকে জানা যায়। স্বীয় সত্ত্বা সম্বন্ধেও সঠিকভাবে অবহিত হওয়া যায়। অজ্ঞতাজনিত চিরন্তন অভাববোধ বিদূরিত হয়।

ঈশ্বরের প্রিয়জনের স্বরূপ চিনব কি করে? আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে যাকে ভণ্ড ভাবি—তিনিই হয়তো প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রিয়জন। আবার যাকে সাধু-মহাত্মা ভাবি তিনিই হয়তো ভণ্ড! অতএব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াই সঙ্গত। যাকে আপনার ভালো লাগে না বা ভণ্ড বলে মনে হয়, সম্ভব হ'লে তাকে এড়িয়ে চলুন—কিন্তু কাউকে অশ্রদ্ধা বা অপমান করবেন না। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভক্তজনের প্রতি আঘাত করলে—সে আঘাত ঈশ্বরকেই আঘাত হানে। এবং বৈষ্ণবাপরাধ গুরুতর অপরাধ। যিনি সাধু অথবা বৈষ্ণবগণকে অপমান করেন বা পর্য্যুদস্ত করেন—ঈশ্বর তাকে কখনই ক্ষমা করেন না। অতএব কাউকেই অশ্রদ্ধা করতে নেই।

সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্ হওয়া সঙ্গত। যিনি সমদর্শী, শ্রদ্ধাবান, সহিষ্ণু, বিনীত ও সেবাপরায়ণ—তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়জনের মাধ্যমে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপালাভ করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে আমি বৃন্দাবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। বৃন্দাবনে এক বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। যাত্রীরা যখন টাঙ্গায় করে

বৃন্দাবন ঘুরে দেখবার জন্য বেরুতেন—সাধুটিও তখন টাঙ্গার পেছন পেছন নাছোড়বান্দার মতো ছুটে যেতেন—'আমায় একটা পয়সা দে, ওরে আমায় একটা পয়সা দে।'

সাধারণ যাত্রীরা সাধুটিকে ভণ্ড বলেই ভাবত। একটা পয়সার জন্য সাধু হয়ে কিনা—এমন আকুলি-বিকুলি! বৃন্দাবনে বাস করেও পয়সার লোভ দূর হলো না ব্যাটার।

অনেকে অনেক রকম ভাবে সাধুটিকে অপমান করত। গালাগালি দিত। কেউ কেউ বা অবহেলা-ভরে দু'একটা পয়সা ভিক্ষে দেওয়ার মতো করেই ছুঁড়ে দিত।

কিন্তু সেই সাধুর স্বরূপ প্রকৃতই একদিন জানা গেল। মূলতঃ ঐ বৈষ্ণব সাধুটির টাকাওয়ালা অনেক বড় বড় শিষ্য ছিল।

যাত্রী সাধারণের কাছে একপয়সা-দু'পয়সার জন্য গুরুর ঐ রকম হেনস্থা দেখে—তাঁর কয়েকজন বড়লোক শিষ্য তাঁর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল: বলুন গুরুদেব! আপনার কত টাকা দরকার? একলাখ—দু'লাখ—আমরা কয়েকজন মিলে চাঁদা তুলে সে টাকা আপনার পায়ের কাছে রাখছি। আপনি এক পয়সা—দু' পয়সার জন্য যাত্রীদের টাঙ্গার পেছনে পেছনে—ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটে যান কেন? সামান্য পয়সার জন্য আপনি অপমানিত হ'ন—তা আমরা চাই না।

বৈষ্ণব সাধুটি শিষ্য-সেবকদের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন—তারপর স্মিতহাস্যে বললেন: ওরে, তোরা আমায় ভুল বুঝিস্‌নে—এ পৃথিবীর কাছ থেকে আমার কিছু চাওয়ার নেই। কারণ কোন কিছুরই দরকার নেই আমার। ওরে, পরম করুণাময় যে আমার সকল অভাবই দূর করে দিয়েছেন রে।

: তবে আর একপয়সা-দু'পয়সার জন্য টাঙ্গার পেছনে পেছনে ছুটে যান কেন? একজন শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন।

বৈষ্ণব সাধুটি শান্তকণ্ঠে বললেন: ওরে মায়াবদ্ধ ঐ যাত্রীদের

দেখে আমার বড় কষ্ট হয় রে। বৃন্দাবন ঘুরে ঘুরেও ওরা কিছু পায় না। দুঃখ দূর হয় না ওদের। পরম করুণাময় কৃষ্ণ কৃপা না করলে —কি করে ওদের দুঃখ দূর হবে বল্? তাইতো আমি চুপ্‌চাপ বসে থাকতে পারি না। যাত্রীদের পেছনে পেছনে 'একটা পয়সা দাওগো' বলে মাইলের পর মাইল ছুটে যাই!

ঃ তাতে আপনারই বা কি লাভ? আর যাত্রীদেরই বা কি লাভ? একজন অনুসন্ধিৎসু শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন সেই বৈষ্ণব সাধুটিকে।

ঃ আমি তো ব্যাবসাদার নইরে, যে লাভ-লোকসান ভেবে কোন কাজ করব? আমার তো কোন কিছুর দরকারই নেই। তবে আমায় যদি হেলায় বা শ্রদ্ধায় ওরা একটা পয়সা দেয়—ওদের যে অনেক লাভ রে?

ঃ কি রকম?

ঃ ওরে, এই সামান্য কথাটা তোরা বুঝলিনে? আমি যে কৃষ্ণের আপনজন—ঐ যাত্রীরা যদি হেলায় বা শ্রদ্ধায় আমাকে একটা পয়সা দেয়, যেহেতু আমায় কৃষ্ণ ভালবাসেন, সেই হেতু ঐ মায়াবদ্ধ জীবদেরও নিশ্চয়ই কৃপা করবেন! ওদের আর ঘুরে ঘুরে মরতে হবে না, তিনি কৃপা করলে—ওদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে রে। আমি ওদের কাছ থেকে কি পেলাম সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আমাকে হেলায় বা শ্রদ্ধায় একটা পয়সা দান করে—ওরা যদি শ্রীকৃষ্ণের করুণা পায়, ওদের যে অনেক লাভ রে? অনাদি কালের ভগবদ্-বিস্মৃতি জনিত দুঃখ ওদের দূর হয়ে যাবে—ওরাও চিরন্তন আনন্দের সন্ধান পাবে। স্মিতহাস্যেই বললেন সেই বৈষ্ণব সাধুটি।

তাই বলছিলাম কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই, কাউকে অশ্রদ্ধা করতে নেই, কে যে ঈশ্বরের আপনজন বা প্রিয়জন বোঝা খুব মুশ্‌কিল। তাই সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ করে যাকে দেখলে—ঈশ্বরের কথা মনে হয়, তিনি স্যুট্‌পরা সাহেব বা ম্লেচ্ছ হ'লেও—শ্রদ্ধায় মাথা নত করা উচিত।

কারণ শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয়ের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত। তাইতো তিনি যথার্থই অচ্যুত।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের নিকট ভক্তই অধিক প্রীতির পাত্র। শ্রীভগবানই বলেছেন ঃ

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
নত্যন্যস্তে ন জানন্তি নাহং তেজো মনাগপি॥

—ভাঃ ৯।৪।৬৮

অর্থাৎ—সাধুগণ আমার হৃদয়—আমিও সাধুদের হৃদয। তারা আমাকে ভিন্ন অপর কাউকে জানেন না—আমিও তাদের ভিন্ন অপরকে জানি না।

মনুষ্য দেহ দুর্ল্লভ বটে, তবে তা ক্ষণভঙ্গুর—তদাপেক্ষা দুর্লভ ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা।

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন কৃপাদৃষ্টিপরাবরে॥

প্রকৃত ভগবৎ ভক্তের কৃপাদৃষ্টিতে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। মায়াবদ্ধ জীবদের ক্ষেত্রে জড়দেহ এবং ভাবদেহ হৃদয়গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ—সেই কারণে জড়দেহের সুখ দুঃখকেই তারা আপন সত্ত্বার সুখ-দুঃখ বলে ভুল করে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে সেই গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হয়, জড়দেহের সুখ দুঃখ তখন আর অনুভূত হয় না। ভাবদেহের বিকাশলাভ ঘটে। ঐ ভাবদেহ—অজর, অমর, অব্যয়, অপ্রকট নিত্যলীলার সঙ্গী।

ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে মায়াবদ্ধ জীবের সকল সংশয়ের অপনোদন হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে—তার মনে আর কোন সংশয় থাকে না। এবং তৎ-কৃপাদৃষ্টি প্রভাবেই তার কর্মাকর্ম লয় প্রাপ্ত হয়। কর্মফল ভোগের প্রশ্ন ওঠে না।

আমাদের জড় দেহে যেমন চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্য ভোজনে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পরিপুষ্ট হয়—জড়দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন তদ্রূপ ভাবদেহও ঈশ্বরের লীলা শ্রবণে ও কীর্তনে পরিপুষ্ট হয়। জড়দেহ লয় প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ভাবদেহের লয়ও নাই—ক্ষয়ও নাই। ঐরূপ ভাবদেহধারী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী—অন্য সকলে নয়।

লীলা শ্রবণে, কীর্তনে—ভাবদেহধারী ভক্তদের ভাবদেহের বিকাশ লাভ ঘটে। ভাবদেহের বিনাশ নাই, ভাবদেহ অজর, অমর, ও অব্যয়। জড়দেহ মাত্রই লয় প্রাপ্ত হয়—কিন্তু ভাবদেহ কখনই লয় প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপালাভের পরেও যদি কেহ শ্রবণ, কীর্তন ও বন্দনাদির দ্বারা ভাবদেহের বিকাশ সাধনে তৎপর না হন—সেক্ষেত্রে ভাবদেহ বিকাশ লাভ করে না।

ভাবদেহধারী ভক্তগণই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃনুয়দথ বর্ণয়েদয়ঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রীতিলভ্য কামং,
হৃদরোগমাশ্ব পহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত অনুবাদ ঃ—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

—চরিতামৃত অ ৫ পঃ

রাসলীলা—শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুরলীলা। সেই লীলায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কেবল মাত্র তাঁরাই অনুধাবন করতে পারেন

—ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে যাঁরা ভাবদেহ লাভ করেছেন। অর্থাৎ যাঁদের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়েছে। জড়দেহ ও ভাবদেহ আলাদা হয়েছে। শ্রবণ, কীর্তন ও বন্দনের মাধ্যমে—যাঁরা ভাবদেহের বিকাশে তৎপর, যাঁদের সকল সংশয় অপনোদিত—রাসলীলা শ্রবণের একমাত্র তারাই অধিকারী।

ভাবদেহধারী রাগানুগা ভজনকারীরাই অপ্রকট নিত্যলীলার সঙ্গী। চরম ও পরমানন্দের শ্বাশ্বত অধিকারী। সমাধির মাধ্যমে ভাবদেহে তাঁরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করেন। জড়দেহে কোন সাধক বা ভক্ত হয়তো বা আশী বছরের বৃদ্ধ, কিন্তু সেই তিনিই আবার ভাবদেহে চিরকুমার বা অনন্তযৌবনা কোন সহচরী—ঈশ্বরের নিত্যলীলার সঙ্গী বা সঙ্গিনী। দৈহিক সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে তাঁরা অপার আনন্দের অধিকারী হ'তে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আমি রামভক্ত মহাসাধক তুলসদাসজী ও তদীয় শিষ্য রবিদাসজীর সমাধি সম্বন্ধে একটি কাহিনী উল্লেখ করছি।

একদিন তুলসীদাসজী মন্দিরে বসে থাকতে থাকতেই সমাধিস্থ হ'লেন। রবিদাস তখন মন্দির প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। গুরুজী সমাধিস্থ হওয়ায় রবিদাসজী ভাবলেন—গুরুজী সমাধিস্থ হয়ে কোথায় গেলেন জানা দরকার।

রবিদাসজী ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রেখে নিজে সমাধিস্থ হ'লেন।

তুলসীদাসজী রামভক্ত। রবিদাসজী সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন যে, তুলসীদাসজী অনন্তযৌবনা তুলসী সখী হয়ে অপ্রকট রামলীলায় ভাবদেহে অংশ গ্রহণ করেছেন। সীতাদেবীর আংটি হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই আংটি। তুলসীদাসজীও সমাধিস্থ হয়ে তুলসী সখিতে রূপান্তরিত সেই আংটিটাই খুজে বেড়াচ্ছিলেন। রবিদাসজীও সমাধিস্থ হয়ে ভাবদেহে সখীরূপ ধারণ করে—পদ্মপত্রে অবস্থিত সেই আংটিটি খুঁজে পেয়ে তুলসী সখীর হাতে দিলেন।

রবিদাসজীর সমাধি ভাঙ্গল। তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতে লাগলেন। কিছু পরে তুলসীদাসজীর সমাধি ভাঙ্গতেই, রবিদাসজী ঝাঁট দিতে দিতে বললেন : গুরুজী, আপনি সমাধিস্থ হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন—তা আমি আমি জানি।

কোথায় গিয়েছিলাম বলতো রবিদাস? জিজ্ঞেস করলেন মহান্ রামভক্ত তুলসীদাস।

আপনি অপ্রকট লীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সীতাদেবীর একটা আংটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সখিরূপে আপনিও খুজছিলেন সেই আংটি। একটা পদ্মপাতার ওপরে পড়েছিল সেই আংটি। আমিই তো খুজে পেয়ে সেই আংটিটা আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলুম। রবিদাস বিনীতভাবেই বললেন।

রবিদাসের কথা শুনে তূলসীদাসজী অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন নি।

অপ্রকট লীলা—ভক্ত-ভাগ্যবানদের পক্ষেই দেখা সম্ভব। জ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের পক্ষে এধরণের ধারণা সম্ভব নয়।

অব্যক্ত অব্যয় সেই পরমপুরুষই যে শ্রীকৃষ্ণ—জীবের প্রতি অসীম করুণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যুক্তিকে খণ্ডন করে— শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকে শাশ্বত সত্যরূপে তুলে ধরেছেন।

তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভক্তিযোগকে জ্ঞানের অধীন বলেই ভাবতেন, এমনকি তিনিও প্রথমদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তাকেও স্বীকার করেননি।

কিন্তু সেই শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অকৃপণ কৃপালাভান্তে ধন্য হয়েছেন। স্বরচিত শ্লোকের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেহধারী সনাতন পুরুষের বন্দনা করেছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে উপলব্ধি করেছেন।

বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও স্বীয় ভক্তিযোগ (যে ভক্তিদ্বারা ভগবানকে আপনজনের মতোই কাছাকাছি পাওয়া যায়) শিক্ষা দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এই এক সনাতন পুরুষ। সর্বদা যিনি কৃপা-সমুদ্র। আমি তাঁর প্রতি প্রপন্ন হই।

মহাকালের দ্বারা স্বীয় ভক্তিযোগকে বিনষ্ট হ'তে দেখে 'কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা' এই সনাতন পুরুষ প্রেমভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করার জন্য আবিভূর্ত হয়েছেন, তাঁর পাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়-রূপে লীন হো'ক।

কৃষ্ণতত্ত্ব বিস্মৃতির মহাসমুদ্রের অতলে ছিল, মহাপ্রভু জীবের প্রতি অসীম করুণাবশেই সেই তত্ত্বকে উচ্চে তুলে ধরেছেন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ—সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু, ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি—সর্ব্বরস পূর্ণ ॥

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম পঃ

বেদান্ত বা উপনিষদে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা বেদান্ত সূত্র পাঠ করেছেন—তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন সেখানে আরাধ্য বস্তু ও পরতত্ত্ব (Supreme Reality) সম্বন্ধে নির্দেশ রয়েছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন—ঈশ্বর মিথ্যা, জীব মিথ্যা—সকলি মায়ার বিকার। তাঁর মতে—ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করচার্য্যের উপরোক্ত মতবাদ খণ্ডন করে

বলেছেন: শাস্ত্র মাত্রই শব্দাত্মক। জাতি রহিত, ক্রিয়া রহিত, ধর্ম রহিত এবং শক্তি রহিত বস্তুর শব্দ দ্বারা কিভাবে প্রকাশ সম্ভবপর?

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিশেষণ রহিত বিশেষ্যকে তুলে ধরেছেন। বিশেষণের উল্লেখ করতে হ'লে—অদ্বৈতবাদের যুক্তি বজায় থাকে না।

সেইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ, বিশেষণ রহিত বিশেষ্য, নিঃশক্তিক সর্বগুণ বর্জিত এবং নিরাকার।

ধ্যায় কি? তাই যদি হয়—তবে আরাধ্য বস্তু কি?

শ্রীশঙ্কর বললেন, জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ধ্যান করতে হবে। তবে ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কোন নির্দেশ দেননি। তাঁর বিচারে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানদাতা নন, জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা নন, আনন্দস্বরূপ আনন্দময়ও নন। এমনকি তিনি জগৎকর্তাও নন।

কিন্তু ব্রহ্ম যদি জগৎকর্তা নাই হবেন—তবে বেদান্ত দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক অর্থাৎ 'অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এবং জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ইত্যাদির তাৎপর্য কি?

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বললেন—নির্গুণব্রহ্ম মায়াযোগে সগুণ ব্রহ্ম হয়ে ঈশ্বর নামে খ্যাত হন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ মায়ারূপ শক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জীব জগতের স্রষ্টা, জীবের উপাস্য, রূপগুণশালী ও সবিশেষ। জীব হ'তে ইনি পৃথক। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের মতোই—এক মিথ্যা মায়া মাত্র। তাই সগুণ ব্রহ্মের উপসনাতে মুক্তি হ'তে পারে না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যুক্তি খণ্ডন করে বললেন:

ব্রহ্ম সচিদানন্দ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসম্যক প্রকাশ বিশেষ অর্থাৎ—Incomplete manifestation, পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশমাত্র (Partial manifestation)। সচ্চিদানন্দ

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবত্তার পরিপূর্ণ ও চরম প্রকাশ। তিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত গুণশালী, মঙ্গল নিলয়, লীলা কল্লোল বারিধি, অচ্যুত ও ভক্তজনের প্রেমাস্পদ—তিনিই পরম পুরুষ। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সাকার, আবার নিরাকারও—তিনিই সব। তিনিই অশেষ, আবার তিনিই শেষ। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতে—ব্রহ্ম কখনও নির্গুণ হ'তে পারে না। আর ব্রহ্মবস্তু কখনও মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হ'তে পারে না।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন—মায়া আচ্ছাদিত ব্রহ্ম হচ্ছেন ঈশ্বর, ভগবান।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের মাধ্যমে বললেন—ব্রহ্মবস্তু নির্গুণও নয়, এবং মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিতও নয়। ব্রহ্মবস্তু যদি মায়াদ্বারা আচ্ছাদিতই হয়ে থাকে—তবে মায়া কি?

মায়াবাদীরা বলেন—মায়া সৎও নয় আবার অসৎও নয়। সৎ বলে একটা তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে—তার উল্টোটা অর্থাৎ অসৎকেও স্বীকার করে নিতে হয়। আবার মায়া যদি সৎও নয়, অসৎও নয়—তবে একটা কিছুতো বটেই। এবং মায়াকে যদি একটা 'কিছু' বলে স্বীকৃতি জানাতে হয়—তবে মায়াকে পৃথক একটা তত্ত্ব হিসাবে অবশ্যই স্বীকৃতি জানাতে হয়। ফলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' —সূত্রকে বাধ্য হয়েই অস্বীকার করতে হয়।

কিন্তু মায়াবাদকে যদি কিছু লোকের কল্পনা প্রসূত বলে ধরে নেওয়া হয়—সব কিছু তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মই মায়ার নিয়ন্তা। ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য আছে, ধর্ম আছে—কিন্তু তা অপ্রকাশিত।

যার বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের প্রকাশ নাই—তাই ব্রহ্ম। গুণ, ধর্ম বা শক্তি বস্তুর পরিচয় প্রকট করে না—অথচ তা চৈতন্য বা সত্তামম

(Consciousness) সেই দুর্নির্ণেয় তত্ত্বই ব্রহ্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশ্য ব্রহ্মকে সত্ত্বাময় বলেন নি—বলেছেন সত্ত্বা।

ব্রহ্ম ব্যতিরেক গুণ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন ভাব মাত্র।

ব্রহ্মেতে সব আছে—অর্থাৎ শক্তি আছে, স্বরূপ শক্তি আছে—কিন্তু স্বরূপ শক্তির প্রকাশ নাই। সেইজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কেবলমাত্র জ্ঞানরূপা সত্ত্বা—সম্পূর্ণ নয়, অর্থাৎ কেবল—Consciousness বা অসম্যক আবির্ভাব মাত্র। যেখানে শক্তির প্রকাশ নেই—তাইতো ব্রহ্মের প্রতীতি অর্থাৎ—Conception.

ব্রহ্ম সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যা তাই অনবদ্য।

> 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান'।
> চিদৈশ্বর্য্য—পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব সমান॥

মুখ্য অর্থে ভগবান্, অনূর্ধ্ব সমান, ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। কিন্তু গৌণ অর্থে ব্রহ্ম। তাই অপ্রাকৃত শরীরধারী সর্বশক্তিযুক্ত পরব্রহ্মাখ্য শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সর্বশক্তি রহিত এবং বিশেষণহীন বিশেষ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বা Subject matter হ'তে পারে না। শাস্ত্র মাত্রই বিশেষণ যুক্ত। ব্রহ্মকে যদি নিরাকারও বলা হয়, নিরাকারটাই তার আকার। ব্রহ্ম কেবল চিৎ বস্তু, পরমাত্মা সৎ ও চিৎ অর্থাৎ Being এবং Consciousness সমন্বিত। এবং তাঁর পরেই ঈশ্বর—অন্তর্যামী পুরুষ ও পরমাত্মা। পরমাত্মা সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা। সর্বজীবের মধ্যেই পরমাত্মা অন্তর্যামী সূত্র ব্যাপ্ত। তিনি সর্বনিয়ন্তা, তিনি গোবিন্দ—অর্থাৎ Controller of senses. অর্থাৎ তিনিই সব—তাঁর সত্ত্বায় সকলের সত্ত্বা, তাঁর অসত্ত্বায়—অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে নিস্ক্রিয়াবস্থা। তিনি মায়া ও জীবকে প্রকট করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন। আর ভগবান হচ্ছেন প্রকটিত—অর্থাৎ Manifested, অবিচিন্ত্য,

বিচিত্রশক্তি বিশিষ্ট, অদ্ভুত। অবিচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে (Through supralogical power) তিনি প্রকটিত হন্ আবার অপ্রকট হন্। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই স্বেচ্ছাক্রমেই সাকার বা নিরাকার।

সেই জন্যেই তাঁকে সাকারও বলা যায়, আবার নিরাকারও বলা যায়। সগুণ ও নির্গুণ—বিরুদ্ধ গুণসমূহ তাঁর মধ্যেই সামঞ্জস্যীকৃত।

"যত্র সর্ববিরুদ্ধধর্মানাং সমন্বয়ঃ স এব ভগবান!"

যাঁতে সকল বিরুদ্ধধর্মাদি সামঞ্জস্যরূপে বিদ্যমান—তিনিই ভগবান।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হ'লেই উপাস্যবস্তু সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যাবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিচারকে খণ্ডন করে বললেন :—

মায়াধীশ' মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত অভেদ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামানুজের আবির্ভাব। অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীশঙ্করের আবির্ভাব আর একাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজের আবির্ভাব।

শ্রীরামানুজ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বললেন—'বৃহত্বাৎ বৃংহনত্বাৎ'। ব্রহ্মই সর্ব বৃহত্তম তত্ত্ব। ব্রহ্মের সীমা পরিসীমা নেই, Calculation করতে পারা যায় না। আমাদের সীমিত Calculation এর বাইরে তিনি। তিনি Time and space এর ঊর্দ্ধে। ব্রহ্ম তারতম্যরহিত অখণ্ড বস্তু, স্বরূপতঃ অসীম, তাঁর গুণবত্তাও অসীম, তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিধ হেয়-বিবর্জিত। তিনি অনন্ত কল্যাণগুণাকর, অকল্যাণকর প্রাকৃত গুণ রহিত—কিন্তু কল্যাণকর গুণরহিত নন্।

শ্রীরামানুজের মতে—জগৎ কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সাকার—বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণই পরতত্ত্ব—পরব্রহ্ম।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যুক্তির বিপরীত যুক্তিই শ্রীরামানুজের।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব (১২৮৮ খৃঃ)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় বা যা হ'তে জন্মাদ্যস্য যতঃ—এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখেননি। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বললেন—সগুণ ব্রহ্মই জগতের কারণ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বললেন—শ্রীশঙ্করের বিচার বেদান্ত-বিরুদ্ধ, কারণ শ্রীশঙ্করাচার্য্য জন্মাদস্য যতঃ শ্লোকটিকে স্বীকার করেন নি।

'জন্মাদস্য যতঃ'···কে স্বীকৃতি জানাতে হ'লে ব্রহ্মকে কোনভাবেই আর নির্গুণ বলা যায় না।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সর্বনিয়ামক, অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়, সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, সর্বশক্তিমান, পরম স্বতন্ত্র, অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, সাকার বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণই পরমব্রহ্ম।

এসম্পর্কে একটি কিংবদন্তী উল্লেখ করছি।

একদিন সমুদ্রস্নান করতে করতে শ্রীমধ্বাচার্য্য পাঁচ অধ্যায় স্তোত্র রচনা করলেন। বালুকা-বেলায় বসে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। আকস্মিকভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—পণ্যদ্রব্যবাহী একটি দ্বারকাগামী নৌকা সমুদ্রের বালুকায় প্রায় প্রোথিত হচ্ছে। নৌকাখানিকে ভাসাবার উদ্দেশ্যে মধ্বাচার্য্য কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করলেন—অর্থাৎ কিছু পণ্যদ্রব্য কিনবেন বলে মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কারণ পণ্যদ্রব্যের ভারে নৌকাখানি সমুদ্রের বালুকায় আটকে গেছে। নৌকাখানি দ্বারকা যাচ্ছিল, যাওয়ার পথেই নৌকাখানি আটকে যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করায়—মাঝিরা নৌকাখানি তীরে নিয়ে আসে।

মাঝি-মাল্লাদের অনুরোধে শ্রীমধ্বাচার্য্য ঐ নৌকার পণ্যদ্রব্যাদির মধ্য থেকে একটি বেশ বড় আকারের গোপীচন্দন খণ্ড কিনলেন।

ঐ গোপীচন্দন খণ্ড নিয়ে শ্রীমধ্বাচার্য্য বাড়ী ফিরছিলেন, কিন্তু পথেই উক্ত গোপীচন্দনখণ্ডখানা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল—এবং ভেতর থেকে একটি বালক-কৃষ্ণমূর্তি' পাওয়া গেল।

কিন্তু ত্রিশজন বলবান লোক ঐ বালক কৃষ্ণমূর্তিকে তুলতে পারল না।

শ্রীমধ্বাচার্য্য উক্ত বিগ্রহকে তুলে উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করে—সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় মতে বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই হ'লো কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। ঐ সাধনবলেই সাধক শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ করে বৈকুণ্ঠে গমন করে থাকেন।

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি বললেন—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্মের অনন্তগুণ, অনন্তশক্তি। ব্রহ্মের মধ্যে গুণ ও শক্তি বিদ্যমান স্বরূপ অনুবর্দ্ধিনী শক্তিযুক্ত। বস্তুতে বস্তুর শক্তি বিদ্যমান থাকেই। শক্তি নেই, গুণ নেই—এমন কোন শক্তির বিচার হয় না। বেদান্তে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব স্বীকৃত। অদ্বয়জ্ঞানের সঙ্গে তাতে কোন বিরোধ বাধে না। বস্তুর মধ্যে শক্তি থাকবেই, শক্তি কোন পৃথক জিনিষ নয়।

অতএব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণ। গুণ ও শক্তি অভেদ এবং গুণ ও শক্তির এই একত্র বিদ্যমানতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ব্রহ্মস্বরূপ সর্ববৃহত্তম, স্বভাবতঃ নিরস্ত সমস্ত দোষ।

'অশেষ-কল্যাণ গুণৈকরাশি জগতকারণ, রসস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক সাকার শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

শ্রীধরস্বামীও সর্বদর্শন সংগ্রহকারে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত ক'রেছেন।

তিনি বললেন—অনন্ত, অনন্ত বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সর্বশক্তিমান, অচিন্ত্যশক্তি বিশিষ্ট, হ্লাদিনী সংবাদিকা স্বরূপ শক্তিদ্বারা নিত্য আনন্দিত, প্রাকৃত গুণহীন, জগৎকর্তা, সাকার শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ও রস স্বরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেছেন—সৎ, চিৎ ও আনন্দযুক্ত। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সগুণ, সর্ববিদ, জগৎ কারণ কিন্তু প্রাকৃত গুণ রহিত বিধায় নির্গুণ, অনন্ত, অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণ বিশিষ্ট বিধায় সগুণ, সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়, সৎ ও সত্ত্বাবান, জ্ঞান ও জ্ঞানবান, আনন্দময়, রসাত্মক ও রসস্বরূপ। বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম, স্মৃতিতে যিনি পরমাত্মা, শ্রীভাগবতে যিনি ভগবান, সেই সাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম।

মায়া সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন--মায়া সৎও নয় আবার অসৎও নয়—অনির্বাচ্য। সেই জন্যেই শ্রীশঙ্করের দর্শনকে বলা হয় নির্বিশেষবাদ।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বললেন—ব্রহ্ম সর্বব্যাপক তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি অনন্ত সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ, অচিন্ত্যশক্তির আধার, সর্বেশ্বর, প্রাকৃতগুণহীন—কিন্তু অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, সৎ ও সত্ত্বাবান, আনন্দ, ও আনন্দময়, সাকার, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব।

একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যই বলেছেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। বিশেষত্বহীন সত্তামাত্র।

শ্রুতির স্মৃতি অনুসারে শ্রীশঙ্করের এ বিচার যথার্থ কিনা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রস্থানত্রয় বলতে—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় প্রস্থান। যে বিচার এই প্রস্থানত্রয়ের অনুমোদিত নয় ভারতীয় সাধনমার্গে বা দর্শনশাস্ত্রে —সে বিচার কখনই সমাদৃত হয়নি।

বেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই—ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল রহস্য।

শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ের মতে—শক্তিই শক্তিমানের বিশেষত্ব। গুণ কার্যাদি সমস্তই শক্তির কার্য্য। ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে রয়েছে। শ্রুতিসম্মত পথেই ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি শ্রুতিকে স্বীকার করতে হয়—তবে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্গুণ বলা যায় না। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের প্রকাশ হয় না। যে-কোন বস্তুর মধ্যেই তাঁর স্বাভাবিক শক্তি বিরাজমান। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। বেদান্ত-সূত্রেও এধরণের বিচারেরই প্রাধান্য।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ মহান দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে ষটসন্দর্ভ নামক গ্রন্থে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এবং কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেছেন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করলে এ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা আসবে। 'জন্মাদস্য যতঃ' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গেলে অদ্বৈতবাদ বজায় রাখা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য- ভেদাভেদ সিদ্ধান্তেই আস্তিক্য দর্শনের পরিপূর্ণতা ও সমন্বয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই তত্ত্বকেই সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব জীবের পক্ষে দুরধিগম্য। তাঁর অসীম করুণা ব্যতীত এ তত্ত্বসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নির্বিশেষবাদ প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের শ্রীমধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানা রচনা করেই শ্রীশঙ্করের যুক্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত মহান পণ্ডিত। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন্ অদ্বৈতভাব থেকে দ্বৈতভাব সুন্দর।

"দ্বৈতং অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"।

তিনি আরও তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ তত্ত্ব,—পরমতত্ত্ব।

শেষের কথাও বলেছেন তিনি :

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীদাভাৎ পিতাম্বরাদরুণ
—বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ,
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্ব নহং ন জানে।

'কৃষ্ণ ছাড়া আর যে কিছু আছে—তা আমি জানি না।'

অতএব বলা যায় শ্রীকৃষ্ণই সব। তিনি ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। তিনিই স্বেচ্ছাক্রমে সাকার, আবার স্বেচ্ছাক্রমে নিরাকার। তিনিই পরমপুরুষ। তিনিই পরমগতি।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—মুক্তি আমার কাম্য নয়। আমি আমার অস্তিত্ব বজায় রেখেই সেই পরমপুরুষের নিত্যলীলার সঙ্গী হ'তে চাই। অনন্ত আনন্দের অধিকারী হ'তে চাই।

ঠাকুর হরিদাসও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন—

'মুক্তি' তুচ্ছফল হয় নামাভাস হইতে।
সে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের নিকট কিছুই কামনা করেন না।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ন্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
—ভাঃ ৯।৪।৬৭

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দুর্বাসাকে বলেছেন—

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হ'লেও তারা তা গ্রহণ করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি বলব ?

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম—সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেও উল্লেখ আছে—

কৃষ্ণভক্ত - দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেম—সেবা—পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥

—চৈঃ মঃ ২৪ পর্ব্বে

দুরধিগম্য কৃষ্ণতত্ত্বকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি অসীম কৃপায় তুলে ধরেছেন। এ কৃপার তুলনা নাই।

তাঁরই অসীম কৃপায়···

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ – প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

—চৈঃ চঃ ১৯৷২৫১

তাঁরই অসীম কৃপায়···

ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান ফল প্রদানে অসমর্থ। সর্বনিরপেক্ষ এবং সর্বসাধিকা ভক্তিতে নিষ্ঠাই ভক্তের গুণ- ভক্তের কর্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠায় ভক্তি নিষ্ঠাচ্যুতি হয় এবং শুদ্ধভক্তিত্ব লোপ পা:

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল।
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তিই হয় জ্ঞান বিনা ॥

শুদ্ধভক্তের ভক্তিতেই নিষ্ঠা। ভক্তিতেই তার হয় পরমপুরুষের সান্নিধ্যলাভ।

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ—আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমার একটিই মাত্র কামনা—জন্মে জন্মে যেন আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০ পঃ

শুদ্ধাভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণলাভ হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করার নামই ভক্তি। এইরূপ ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্মের ব্যবধান-রহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নির্মল, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মরূপ দ্বারা এইরূপ ভক্তি আচ্ছাদিত নয়।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—

অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

ভক্তি থেকেই আসক্তি, আসক্তি থেকেই কৃষ্ণ-প্রীতি। কৃষ্ণ-প্রেমই সকল আনন্দের আকর।

কৃষ্ণতত্ত্বকে মহাপ্রভু তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সকল যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বললেন: শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ। তিনিই পরমগতি। তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য। তিনিই সর্বেশ্বর। তাঁর সত্ত্বায়—সকলের সত্ত্বা। তিনি অবিচিন্ত্য, বিচিত্রশক্তি বিশিষ্ট। অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে তিনি প্রকট হয়ে থাকেন—আবার অপ্রকট অবস্থায় বিরাজ করেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁকে জানলেই সব কিছু জানা হয়ে যায়, তাঁর কৃপা বা সান্নিধ্য পেলেই সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়।

বেদ অধ্যয়নে তাঁকে পাওয়া যায় না, কঠোর তপস্যায়ও তাঁকে পাওয়া যায় না, গ্রন্থাদি পাঠে গ্রন্থকীট হওয়া যায় বটে—কিন্তু তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁকে জানা যায় না। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের

অধীন, ভক্তজনের অসীম ও অকৃপণ কৃপাছাড়া—এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জন—যখন ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন, তখনই তাঁর হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ জড়দেহ থেকে ভাবদেহ বিচ্ছিন্ন হয়। জড়দেহ বর্দ্ধনের জন্য যেমন চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন—ঐ ভাবদেহের বিকাশ সাধনের জন্য তেমন ঈশ্বরের লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি আবশ্যক। কারণ তাতেই ভক্তজনের ভাবদেহের বিকাশ লাভ ঘটে। ভাবদেহ অজর, অমর ও অব্যয়।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে সকল সংশয় অপনোদিত হয়, কর্মাকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপা পেলেই হবে না, সেই কৃপাকে ধরে রাখার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন ঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকাশে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি, 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০ পঃ

বৈষ্ণব হওয়া সহজ নয়, ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাকে নিজের

মধ্যে ধরে রাখাও সহজ নয়। উত্তম হয়েও নিজেকে তৃণাধম জ্ঞান করতে হবে। বিনীত হ'তে হবে। তরুর মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে। কাঠুরেরা যখন তরুর অঙ্গচ্ছেদন করে, তখনও তরু (বৃক্ষ) তার শাখাবাহু প্রসারিত করে সেই কাঠুরিয়াদের ছায়া প্রদান করে। শুকিয়ে গেলেও তরু জল প্রার্থনা করে না। বরং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করে—এবং বৃষ্টি রৌদ্রাদি সহ্য করে অপরকে রক্ষা করে।

উত্তম হয়েও বৈষ্ণবকে নিরভিমান হ'তে হবে। এমনকি অভিমানটুকুও থাকবে না। 'আমি সকলের চেয়ে দীন'—এ ধরনের দীনতারও অভিমান থাকবে না তাঁর।

ভক্তমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের আপন জন। তিনি অচ্যুত। তিনি সর্বদা ভক্ত হৃদয় থেকে চ্যুতি রহিত। অর্থাৎ সর্বদা ভক্তজনের সাথে সংযুক্ত।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন: 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান।' অর্থাৎ ভগবান ভক্তের ভক্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও দাসাভিমানে ভক্তজনের মহিমা বর্ণনা করেছেন:

'তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥'
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।'

শুধু এখানেই ক্ষান্ত হ'লেন না তিনি, স্বীয় ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'সেবক করিয়া মোরে সবেই জানিবা।'

আরও বললেন:

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যত্তপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ১ অঃ

মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥

—চৈঃ ভাঃ পঃ ৬ অঃ

উনপঞ্চাশ

সেই পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হ'লে—কৃষ্ণভক্তজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'তে হবে। প্রেম-ভক্তি পরায়ণ হ'তে হবে। ভক্তজনের কৃপা ছাড়া তাঁর ধারে-কাছেও যাওয়া যাবে না। ভক্তদের প্রতি তাই ভক্তিপরায়ণ হ'তে হবে। কারণ ভক্তগণই কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন।

কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥
এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ

কৃষ্ণ ভজনের যদি ইচ্ছা থাকে, পরম প্রেমময়ের সান্নিধ্য পাওয়ার যদি কোন অভিলাষ থাকে—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তজনের ভজনা সবার আগে সুরু করতে হবে। কারণ ভক্তজনের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া অসম্ভব।

'কৃষ্ণ' ভজিবারে আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥

বৈষ্ণবদের প্রতি তাই শ্রদ্ধাবান হ'তে হবে। ভক্তিপরায়ণ হ'তে হবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী স্বয়ং ভগবান নিজেও বৈষ্ণব সেবা করে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষাই পরম শিক্ষা।

কলিযুগের মানুষদের প্রতি অসীম করুণায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—

কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম গুণ বই না বলিহ আর॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৪-৭৮

কঠোর সাধন নয়। বেদ অধ্যয়ন নয়। পরমকরুণায় মহাপ্রভু মহামন্ত্র দিলেন আমাদের। তাই কলিযুগে জন্মে আমরা ধন্য।

মায়াবদ্ধজীব সচরাচর সেবাবিমুখ এবং যথেচ্ছাচারী। তাদের পক্ষে নিয়ম নির্বন্ধ না করলে জীবন সংযত ও ভজনরত হয় না। নির্বন্ধ—শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ।

'এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে।

—ভাঃ ৬।১।১২

অর্থাৎ যিনি এরূপ নিয়ম পালন করে চলেন ক্রমশঃ তিনি মঙ্গল লাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি—সিতাপপ্যবিদ্যা
পিত্তোপতপ্ত রসনস্য ন রোচিকা ন।
কিন্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥

যার রসনা অবিদ্যাদ্বারা উত্তপ্ত, তার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ চরিতাদি সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না; কিন্তু যদি সমাদেরর সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই নামাদি অনুদিন সেবন করা যায়—তবে ক্রমে আস্বাদন বৃদ্ধি পায়। নামে রুচি জাগে। নাম নিতে নিতে ভাব-তন্ময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবং কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ভোগব্যাধির মূল যে অবিদ্যা—সেই অবিদ্যার উপশম হয়। অবিদ্যা বিদূরিত হওয়ার পর পরম পাওয়ার আনন্দে চিত্ত উদ্ভাসিত হয়।

কিছুদিন আগে কোলকাতার রাজপথে একদল সাহেব মেমকে ভাবতন্ময় হয়ে নাম-সংকীর্ত্তন করতে দেখেছিলুম—আমার বারবার

তাদের চরণের ধূলিকণা মাথায় ধারণ করতে ইচ্ছা জেগেছিল। কোলকাতার রাজপথের ধূলিকণা আমি মাথায় ঠেকিয়েছিলুম সেদিন,—নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের ধূলিকণা যেমন করে মাথায় ঠেকিয়েছিলুম—ঠিক তেমনি সাহেব-মেম ভক্তদের চরণের ধূলিকণা মাথা ঠেকিয়েছিলুম। সাহেব-মেম বলে নয়, নিরন্তর কৃষ্ণনামে সাহেব-মেমদের মধ্যে ভাবতন্ময়তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ভারতীয় ভক্ত ও বিদেশী ভক্তদের মধ্যে আমি কোন প্রভেদ দেখতে পাইনি।

মহাপ্রভুর দেওয়া সেই মহামন্ত্রের শক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি—মুগ্ধ হয়েছি। তাই বলেছি—কলিযুগে জন্মগ্রহণ করে আমরা ধন্য।

কলিসন্তরনোপনিষদে দেখা যায় যে—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলি কল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষ-বিনাশকারী। এর থেকে শ্রেষ্ঠ উপায়ের নির্দেশ—সর্ববেদেও নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে বলেছেন:—

'বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে॥

—চৈঃ চঃ অ: ৭।৭৯

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরতো দিনে তিনলক্ষ নাম জপ করতেন।

'বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
তিনলক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ অঃ

রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বারবণিতা যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে

বাহার

দেখা করে তাঁর সঙ্গ কামনা করেন, তখন তিনি উক্ত বারবণিতাকে বলেছিলেন :

—'তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার ॥

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র যখন প্রাপ্য অর্থের অনাদায়ে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাণীনাথ পট্টনায়ককে চাঙে চড়িয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন এবং রাজপুত্রের হুকুম মতো শ্রীল বাণীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে উঠানো হয়েছিল।

মহাপ্রভু কোন সংবাদদাতার মুখে অনুরূপ সংবাদ পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন :

বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল ?

সংবাদদাতা তখন মহাপ্রভুকে বিনীতভাবে জানালেন :

বাণীনাথ নির্ভয়েতে কয় কৃষ্ণনাম।
'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' লয় অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি দুই অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥

—চৈঃ চঃ ৩।৫৫-৫৭

ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন :

চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া।
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।'

লক্ষেশ্বরের কাছে মহাপ্রভু ভিক্ষা করতে সম্মত। মহাপ্রভুর কথা শুনে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণকারীরা বিচলিত বোধ করলেন, কারণ তাঁরা কেউ লক্ষপতি নন।

'বিপ্রগণ স্তুতি করি কহেন গোসাঞি'।
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই ॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনই পুড়িয়া হউক ছারখার ॥'

মহাপ্রভু তখন বুঝতে পারলেন, ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণগণ

তিপায়

তাঁর 'লক্ষেশ্বর' শব্দটির সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি,—তাই তারা বিচলিত বোধ করছেন।

প্রভু বলে—"জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥
সে-জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥'
শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥
"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥"
প্রতিদিন লক্ষনাম সর্ব্বদ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্রের ভিক্ষার কারণে ॥

—চৈঃ ভাঃ অ ৯।১১৬-২৬।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী চৈতন্যাষ্টকে বলেছেন—

"উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিত ভুজ, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?"

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা।
কৃতগ্রন্থি-শ্রেণী সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগখেলঞ্চিত ভুজঃ।
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা জপ অপেক্ষা শ্রেয়, কারণ জপকর্ত্তা কেবল মাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকারী নিজেকে এবং শ্রোতৃসাধারণকে পবিত্র করে থাকেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাকে নির্গুণ ও অব্যক্ত বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপী মহাপ্রভু নিজের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান স্বয়ং। তাঁর ওপরে আর কিছু নাই। সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্য মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপেই সাকার—তিনি প্রেমভক্তির বশ।

তাই তো মহাপ্রভু স্বনাম প্রচার লীলায়—কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর।

'আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু নাহি ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ২৮ অঃ

আন কথা আর নয়। কৃষ্ণ কথা বিনা আর কোন কথা নয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিনা আর কোন কীর্ত্তন নয়। কলির মায়াবদ্ধ জীবদের প্রতি পরম স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান বললেন—শয়নে, ভোজনে বা জাগরণে—নিরন্তর কৃষ্ণনাম লও। নামেই অপার আনন্দ। নামেই মুক্তি। নামেই পরামুক্তি। তারপর মুক্তিকেও তুচ্ছ মনে হবে।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধাভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ

নাম থেকেই কৃষ্ণ প্রেমধন। কৃষ্ণ প্রেমধনের মতো আর ধন নাই। জাগতিক সকল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ তার কাছে।

'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে না মণি'—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সে

প্রেমধনের কথা বলেছেন। যে ধনে ধনবান হয়ে—শ্রীল সনাতন পরশমণিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণপ্রেমধনের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সেই অদ্বৈতবাদকে মনে প্রাণে স্বীকার করতে পারেননি, তাইতো তিনি অকপটে বলেছেন: "আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে/আমার সকল অহঙ্কার ঘুচাও চোখের জলে।"

তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শন বলে স্বীকার করতে আমার একটুও দ্বিধা হয় না। তাঁর কবিতার যে যাই ব্যাখ্যা করুন—তিনি ভগবানের অত্যন্ত কাছের মানুষ একথা স্বীকার করতে আমার এতটুকু আপত্তি হয় না। আমি তাঁকে ভগবানের আপনজন ভেবেই শ্রদ্ধায় বারবার নত হই। রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে থেকে অসীম ও অনন্তকে উপলব্ধি করেছিলেন—তাঁর রূপে-রসে-ভাবানুভূতিতে তাই তিনি বারবার সোচ্চার হয়েছেন। চরম পাওয়ার পরমানুভূতি ছাড়া এভাবে সুন্দরের প্রশংসায় সোচ্চার হওয়া যায় না।

জাগতিক চরম ভোগের মধ্যে সুখ নেই, সুখ নেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থশালী হয়েও। চিরন্তন সুখ বা আনন্দ জাগতিক কোন কিছুর মধ্যেই পাওয়া যায় না। তাই আমেরিকান সাহেব-মেমরা পর্য্যন্ত চরম আনন্দের সন্ধানে সুদূর আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছেন, খোল বাজিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে হরি সংকীর্ত্তন করছেন, নাম করতে করতে ভাবে তন্ময় হয়ে পড়েছেন।

পরম পাওয়ার আনন্দে জাগতিক সুখ-ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বলে মনে করেছেন।

কৃষ্ণকে চিনিয়ে দেবার জন্য, ধরিয়ে দেবার জন্য—আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তদের কাছে অশেষ ঋণী। অনাদি আদি যে গোবিন্দ—সেই গোবিন্দ প্রেমভক্তির বশ, জীবের প্রতি অশেষ ও

অকৃপণ করুণা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে আমাদের মুক্তির উপায় বললেন।

তাই কলিযুগে জন্মে আমরা ধন্য, কারণ বৃন্দাবনের সেই কৃষ্ণ, রাধিকার মহাভাব নিয়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত।

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কণ্ঠ আমাদের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ঃ

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮ অঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবত পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত অনাদিকাল সিদ্ধ, সর্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং ব্রহ্মতুল্য। শ্রীমদ্ভাগবত—পুরাণশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানের বিষয় এতে সন্নিবেশিত বলেই—ভাগবত নামকরণও সার্থক।

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত—পঠন—শ্রবণ ভক্তিময়॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুও বলেছেন ঃ

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

পুরাণান্তরে শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তবিগ্রহ বলা হয়েছে।

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার সংসার সাগর পার হবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটি স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গস্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ পাদযুগলের প্রতীক, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়ের প্রতীক, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুই বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশম

স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্ম স্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ-ললাট দেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ —মস্তকের প্রতীক।

ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষক লীলায় নবদ্বীপ ভ্রমণকালে স্বীয় অভিন্ন স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণের অবতার।
সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে কয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাশীতে অবস্থানকালীন আচার্য্য লীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাদানচ্ছলে বলেছেন :

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং' 'পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
সেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক, উপনিষৎ কহে একমত॥
কৃষ্ণভক্তি রস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা।

স্বরাট ও স্বাধীন ভগবান কেবলমাত্র ভক্তিরই বশ। যেহেতু ভগবান অচ্যুত, তিনি সর্বদা ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ভক্ত সঙ্গ লাভ ছাড়া কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না। স্বকৃত কর্মফলেও বৈকুণ্ঠ-নাথের প্রিয়জনের কৃপা লাভ করা যায় না। এই কৃপালাভ—যাদৃচ্ছিক।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ভক্তিলতা বীজ অর্থে শ্রদ্ধা। ভগবানের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি লাভ করার পরই ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। অতএব সাধু-গুরু-সঙ্গ ভিন্ন শ্রদ্ধালাভ হয় না।

কৃষ্ণ ভক্তি—জন্ম হয় সাধু সঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

ভগবানের প্রতি তখনই জীবের শ্রদ্ধালাভ হয়, যখন সকল সংশয় দূরীভূত হয়। মায়াবদ্ধ জীব সদাই সংশয়যুক্ত। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় অনবরত দোদুল্যমান। সাধুসঙ্গই এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। সকল সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারে। কৃষ্ণভক্তির মূল সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গেই সকল সংশয়ের অবসান হয়—ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। ভগবানের গুণগান শ্রবণে, কীর্ত্তনে অনর্থ বা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ার পরেই ভক্তিনিষ্ঠা জাগরিত হয়। ভক্তিনিষ্ঠা জাগার পর—ভগবানের নাম ও লীলা শ্রবণে রুচি জন্মে, সুখানুভূতি হয়। রুচি থেকেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি হয়। এবং কৃষ্ণাসক্তি থেকেই কৃষ্ণে প্রীতি সঞ্জাত হয়।

ভক্তজনের কৃপাতেই ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

ভগবদবতার মহর্ষি বেদব্যাস, বেদবিভাগ, মহাভারত ও পুরাণাদি রচনা করলেন বটে। কিন্তু তখনও তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হ'লো না। সব কথা বলা হ'লো বটে—কিন্তু মূল কথাই যে বলা হ'লো না।

অপ্রসন্ন চিত্ত নিয়েই মহর্ষি বেদব্যাস সরস্বতী নদীকূলে বসে

ভগবদ্ চিন্তায় সমাহিত হ'লেন' তখন যাদৃচ্ছিকী গতিবিশিষ্ট ভক্ত-প্রবর নারদ ভগবদ্ গুণগান করতে করতে সরস্বতী কূলে এলেন।

ব্যাসদেব নারদের পূজা করলেন। পূজান্তে নারদকে বললেন—বেদবিভাগ, মহাভারত ও পুরাণাদি রচনা করেও আমার চিত্ত প্রসন্ন নয় কেন প্রভু?

নারদ বেদব্যাসকে বললেন,—আপনি শ্রীহরির চরিত কথা বর্ণনা করুন। হরির চরিত কথার মধ্যেই সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মীমাংসা ও পরম প্রশান্তি। অন্য কোন কথায় সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসা ও পরম প্রশান্তি লাভ হয় না। তর্ক থেকে তর্কান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয় কেবল।

উপদেশ প্রদানের পর বেদব্যাস নারদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা দেবার পর নারদ অন্যত্র চলে গেলেন।

ব্যাসদেব বদরীবৃক্ষ পরিশোভিত শ্যামপ্রাস আশ্রমে অবস্থান করে—গুরু নারদের পরমর্শানুযায়ী চিত্ত স্থির করে ধ্যান করতে লাগলেন।

ভক্তিযোগের অসীম প্রভাবেই ব্যাসদেবের সকল সংশয়ের অবসান ঘটল, তিনি সমাহিত হলেন। কান্তি, অংশ ও স্বরূপ শক্তি—সমন্বিত পূর্ণ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, এবং তাঁরই পশ্চাদ্ভাগে তদাশ্রিতা মায়াকেও দর্শন করলেন।

মায়া প্রভাবেই জীব সমুদয় সম্মোহিত, জীব স্বয়ং গুণাতীত হয়েও আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে আপনাকে গুণময় স্বরূপে দর্শন করেও, মায়ারই প্রভাবে অভিমানাদিদ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে। ভগবদ্ বিস্মৃতি জনিত কারণে জীবের নিরন্তর দুঃখ।

অতএব ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত নিশ্চলা হরিভক্তিই জীবের সংসার দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়।

বেদব্যাস চরম উপলব্ধি লাভ করলেন এবং মায়াবদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করলে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তি সঞ্জাত হয়।

ভক্তরাজ পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করছিলেন—তখন অশ্বত্থামা মাতৃগর্ভস্থ সেই ভ্রূণকে বিনাশ করার মানসে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন।

পরীক্ষিৎ জননী উত্তরা নিরুপায় হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লন। ভক্তবৎসল ভগবান্ সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করে, ভ্রূণ রক্ষা করার নিমিত্ত অলক্ষ্যে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি গর্ভরক্ষা করেন এবং গর্ভস্থ শিশুকে দর্শন দান করেন।

যৌবনকালে মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়া করতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত হন, এবং শমীক মুনির কাছে তদীয় আশ্রমে গিয়ে তৃষ্ণার বারি প্রার্থনা করেন।

শমীক মুনি যদিও আশ্রমেই অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তিনি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শমীক মুনির বাহ্যজ্ঞান না থাকায়, রাজা বারবার বারি প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে অতিথি সৎকার করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ শমীক মুনির বাহ্যজ্ঞান না থাকার ফলেই—তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে তৃষ্ণার বারি দিতে পারেন নি। কারণ রাজার প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর হয় নি।

ঈশ্বর-প্রেরিত বুদ্ধিবশে তৃষ্ণার্ত মহারাজা নিজেকে অপমানিত বোধ করেন, এবং ক্রোধবশে শমীক মুনির গলায় একটি মরা সাপ ঝুলিয়ে আশ্রম ত্যাগ করেন।

কিন্তু মুনিপুত্র শৃঙ্গী দূরে সহচরগণের সঙ্গে ছিলেন, তিনি দূর থেকে রাজার এরূপ আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আচমনান্তে অভিসম্পাত করেন: আজ থেকে সাতদিনের দিন উক্ত অবমাননাকারীর তক্ষক সর্পদংশনে মৃত্যু হবে।

মুনিপুত্রের অভিশাপের কথা যখন মহারাজ পরীক্ষিতের কর্ণগোচর হল, তিনি মোটেই বিচলিত বোধ করলেন না। কারণ

মুনির আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসবার পর স্বীয় অন্যায় আচরণের জন্য দুঃখবোধ করছিলেন তিনি। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। শমীক মুনির যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ছিল না এ বোধ তাঁর ছিল না। অতএব মহারাজ পরীক্ষিৎ অন্যায় আচরণের ফলস্বরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করছিলেন। নিরন্তর অনুতাপও ভোগ করছিলেন।

মুনিপুত্রের অভিসম্পাতকে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। অনুতাপের অনলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয়ের হস্তে বিশাল রাজ্যভার সমর্পণ করে তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন ব্রতে নিরত হয়েছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের এরূপ সুসঙ্কল্পের কথা শুনে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তথায় সমবেত হয়েছিলেন অভিনব কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে এই পরীক্ষিৎকেই ভগবান ব্রহ্মাস্ত্র হ'তে রক্ষা করেন। ঋষিগণ ভগবানের এরূপ আচরণের কথা শুনেছিলেন—কিন্তু সেই রাজা পরীক্ষিৎকেই ভগবান অন্তিমকালে কিরূপে ব্রহ্মশাপ হ'তে রক্ষা করেন, এ ধরনের অভিনব কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তথায় সমবেত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যতক্ষণ না শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঋষিগণ তথায় অপেক্ষা করবেন বলেই স্থির করলেন।

সকলেই যখন নিদারুণ উৎকণ্ঠা সহ অপেক্ষা করছেন—ঠিক এমন সময় আকস্মিক ভাবেই অবধূত বেশে সর্ব মনোনয়ন আকর্ষণ করে মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব ঘটল।

মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আকস্মিক আগমনে সকলেই চমকিত হ'লেন—নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্রীবেদব্যাস ও শ্রীনারদ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎও মনো-নয়ন আকর্ষণকারী শ্রীশুকদেবকে চিনতে ভুল করলেন না, তাঁকে মহান্ আশ্রয়দাতা ভেবেই প্রণাম করলেন, বসবার জন্য আসন দিলেন। তারপর রাজা মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন: প্রভু, এ অবস্থায় আমার কি করা সঙ্গত?

গুরু শ্রীব্যাসের আদেশে শ্রীশুকদেব আসন গ্রহণ করলেন এবং সমুদ্রমন্থনোত্থিত স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত-ধিক্কারী—শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত বর্ষণ করে মৃত্যুভয়ে ভীত মহারাজ পরীক্ষিতকে চির অভয়-অশোক শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করালেন।

শ্রীকৃষ্ণকথারূপ অমৃতের তুলনা নেই। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে স্বর্গামৃত উত্থিত হয়েছিল—শ্রীকৃষ্ণকথারূপ অমৃতের কাছে সেই স্বর্গামৃতও তুচ্ছ। এবং বহু সাধনার ফলে যে মোক্ষরূপ অমৃত লাভ হয়—শ্রীকৃষ্ণকথারূপ অমৃতের কাছে সেই মোক্ষরূপ অমৃতও তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মুখে কৃষ্ণকথা শুনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই বললেন:

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ।

—ভাঃ ১২।৬।২

আমি অনুগৃহীত হলেম—চরিতার্থ হলেম। আপনি করুণা করে আমাকে আদি ও অন্ত-রহিত শ্রীহরির কথা শুনালেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিষ্ঠায় আমার অজ্ঞান অপসারিত হয়েছে। মঙ্গলরূপী ভগবানের সেই মঙ্গলময় পরমপদ আপনিই আমাকে দর্শন করালেন।

ভগবানের অকৃপণ কৃপা গুরু ও ভক্তের মাধ্যমে ভাগ্যবান জীবের প্রতি বর্ষিত হয়। ভগবানই কৃপা করে গুরুরূপে ভাগ্যবান জীবের নিকটে সমাগত হন্।

জেবাই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে স্বীয়ভক্ত অর্জুনের মাধ্যমে জীবকুলকে শিক্ষা দিয়েছেন। মহাভারতের ঐ অংশ 'অর্জুন-গীতা' নামে আখ্যাত। মৌষল-লীলায় অপ্রকট হওয়ার পূর্বে ভক্তপ্রবর উদ্ধবের হৃদয়ে অজ্ঞান-তমসার জাল সৃষ্টি ক'রে,—জীবের অমঙ্গল বিনাশের কারণে দুর্লভ শিক্ষা প্রদান করেছেন। ঐ অংশ শ্রীকৃষ্ণউদ্ধব সংবাদ বা উদ্ধব-গীতা নামে অভিহিত।

অর্জ্জুন ও ভক্তপ্রবর উদ্ধব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসের ভক্ত হ'লেও—উভয়ের অনুভূতি ও অধিকার একপ্রকার নয়। অর্জ্জুন গৌরব সখ্যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহচর ও সেবক, আর উদ্ধব বিশ্রম্ভ সখ্যে মাধুর্য্যময় ভগবানের সহচর ও সেবক। উদ্ধবের প্রতি ভগবানের কৃপাও তাই অত্যধিক। ভক্তপ্রবর উদ্ধব ব্রজভূমির সুবলসখার ন্যায়ই উজ্জ্বলরসাধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীগোপীগীত আলোচনা প্রসঙ্গেও তিনজন মুখ্য হরিদাস হিসাবে উদ্ধবের পরিচয় পাই।

গোপীগণ বেণুগীত শ্রবণে তন্ময়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টিতসমূহ বর্ণনা করতে করতে কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত ময়ূরাদির ভাগ্যকে প্রশংসা করেছেন। এবং গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সুখ-সৌভাগ্য কথন প্রসঙ্গে তাঁকে 'হরিদাসবর্য্য' বলে পরিচয় দিয়েছেন। অতএব আমরা তিনজন মুখ্য হরিদাসের পরিচয় পাই (১) প্রথম হরিদাস ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির (২) দ্বিতীয় হরিদাস উদ্ধব এবং (৩) তৃতীয় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন।

উদ্ধব প্রসঙ্গে স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী বলেছেন:

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ ॥

মন্ত্রী—যেরূপ বাক্যে ব্রজবাসিগণের সান্ত্বনা লাভের সম্ভাবনা,

সেই বিষয়ে উদ্ধব অভিজ্ঞ বিধায় উপরোক্ত শ্লোকে উদ্ধবকে মন্ত্রী বলা হয়েছে।

উদ্ধব—কৃষ্ণ দয়িত। অর্থাৎ কৃষ্ণ দয়িতাগণের ব্রজপ্রেমসুধা-রসপানের যোগ্য।

সখা—ব্রজের সুবল সখার ন্যায় উদ্ধবের হৃদয়েও উজ্জ্বলরস বিদ্যমান।

ভাগবতের ৩।৪।৩১ শ্লোকানুসারে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব ব্রজবাসিগণের নিকট সার্থক-রূপে ব্যক্ত করতে সমর্থ।

বৃহস্পতির শিষ্য—উদ্ধব সর্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ। কিন্তু কৃষ্ণবশীকারক ব্রজগোপিনীগণের প্রেমতত্ত্ব বৃহস্পতিরও অগম্য। উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য হয়েও সেই পরম প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত। অর্থাৎ অনভিজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁর দয়িতা শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার দ্বারা উদ্ধবকে পরম প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছেন।

উদ্ধব বুদ্ধি সত্তম—অর্থাৎ অতি বুদ্ধিমান। অসাধারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি তার! অতএব পরম প্রেমতত্ত্ব অবধারণের যোগ্য। ব্রজ-গোপিনীগণের যে প্রেমের কোন তুলনা নাই—নৃলোকে, দেবলোকে এবং সত্যাদি কোন লোকে এমনকি পরব্যোমেও এবং মথুরা বা দ্বারকাতেও ব্রজাঙ্গনাদের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা মেলে না।

স্বীয় বিরহে ব্রজাঙ্গনাগণের দুঃখ স্মরণ করে সুদুঃখিত শ্রীকৃষ্ণ তাদের দুঃখ প্রশমনের জন্য এবং সেই ছলে ব্রজগোপিনীগণের অপ্রাকৃত প্রেমের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে জগতকে অবহিত করার জন্য স্বীয় সংবাদ প্রেরণে সমুৎসুক শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—এই মধুপুরে এমন পরম তপস্বী এবং যোগ্য ব্যক্তি কে আছে—যাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে ব্রজাঙ্গনাগণের কৃষ্ণপ্রেমের মহাসিন্ধুতে অবগাহন করানো যায়।

অকস্মাৎ উদ্ধবকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে, উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়-গণের প্রধান। উদ্ধব ব্রজে গমন করে যদি ব্রজরাজ নন্দ,

পরবর্তী

যশোদা, গোপগণ ও গোপীগণের প্রেম-মাধুর্য্য স্বয়ং উপলব্ধি করে মধুপুরে প্রত্যাগমন করে এবং ফিরে এসে মধুপুরবাসী যাদবগণের কাছে সেই প্রেমমাধুর্য্যের বিবরণ প্রদান করে—তবে মধুপুরবাসী যাদবগণ সহজেই সেকথা বিশ্বাস করবেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজে-গমনাগমনের সুবিধা ঘটবে। কারণ ব্রজবাসিগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রবল অনুরাগের কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মধুপুরবাসীগণের নিকট গোপন রেখেছিলেন।

ব্রজগোপিনীদের কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে :

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধুগণের এই ভাব নিরবধি॥
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস—আস্বাদ কারণ॥
অতএব সেইভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অতি গূঢ়। দাস্য, বাৎসল্যাদি ভাবেও ঐ মহাভাব সম্বন্ধে অনুভব করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম-পুরুষ, সখীরূপে যাঁরা নিত্যলীলার সঙ্গিনী—একমাত্র তাঁরাই এই মহাভাব সম্বন্ধে সঠিকরূপে অবহিত।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
যবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁর করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

প্রেমবাটি

সখীভাবে যাঁরা কৃষ্ণকে ভজনা করেন, রাগমার্গের ভক্ত যারা তাঁরাই মাত্র এই মাধুর্য্য রস আস্বাদনের যোগ্য—অপরে নহে। শান্ত নয়, সখ্য নয়, দাস্য নয়, বাৎসল্য নয়—শ্রীকৃষ্ণকে আপন দয়িত ভেবে উপাসনা সহজসাধ্য নয়।

রাগানুগা ভজনকারী বৈষ্ণবগণ এই মাধুর্য্যমণ্ডিত সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। বাইরে তিনি বৃদ্ধ পুরুষ—কিন্তু ভাবদেহে তিনি অনন্ত-যৌবনা সখী—অপ্রকট নিত্যলীলার সঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণই সেখানে একমাত্র পরম পুরুষ। প্রিয়তম—দয়িত।

উদ্ধব মূর্ত্তিমান উৎসব। বিরহ-ব্যথা-কাতরা ব্রজললনাগণ উদ্ধবকে দেখে আনন্দিত হবেন, এই কথা ভেবে ব্রজললনাগণের বিরহবেদনা-নাশক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নন্দব্রজে পাঠালেন।

উদ্ধবও ব্রজেন্দ্রনন্দনের বার্ত্তা বহন করে ব্রজে গেলেন। প্রথমে গোপরাজ উদ্ধবকে অর্চ্চনা করে শ্রীকৃষ্ণের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এবং কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন। তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরাগ দর্শনে উদ্ধব যারপরনাই অভিভূত হলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ ও কৃষ্ণকথা বর্ণনা করে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

পরদিন সকালে ব্রজললনাগণ ব্রজদ্বারে রথ দেখে ভাবলেন—আবার বুঝি নিষ্ঠুর সেই অক্রুরের আগমন ঘটেছে। ব্রজললনাগণ যখন অক্রুরের পুনরাগমন আশঙ্কায় বিলাপ করছিলেন,—উদ্ধব তখন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তাদের নিকট উপস্থিত হ'লেন।

ব্রজগোপিনীগণ তাঁর পরিচয় পেলেন। এবং তিনি যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে কৃষ্ণলীলাসমূহ স্মরণ করে উদ্ধবের সামনে দাঁড়িয়েই বিনম্রভাবে রোদন করতে লাগলেন। সর্ব্বকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধিকার আকুলতায় উদ্ধব অত্যন্ত অভিভূত হ'লেন। উদ্ধব ব্রজললনাদের নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং ব্রজললনাদের একান্ত অনুরোধে তিনমাস ব্রজে অবস্থান করার পর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয় বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত কথারসস্য ॥ —ভাঃ ১০।৪৭।৫৮

নিখিলজীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ব্রজগোপিণীগণের অনন্যগত পরম প্রেম সঞ্জাত হওয়ায়—তাঁরাই কেবল মাত্র সার্থক জন্মলাভ করেছেন। ভবভীত মুমুক্ষু মুনিগণ এবং আমার মতো ভক্তগণ সর্বদা ঐ ধরণের প্রেমভাব প্রার্থনা করে। অতএব কৃষ্ণকথা রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি, অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও কৃষ্ণকথা রসিকগণই সর্ব্বোত্তম।

উদ্ধব শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দয়িতা ব্রজললনাগণের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হ'লেন না, তিনি যে তাঁদের চরণরেণুর প্রার্থী একথাও নিঃসঙ্কোচে বললেন:

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাৎ
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথঞ্চহিত্বা,
ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি বিমৃস্যাম্ ॥

যারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ করে শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করেছেন—অহো-; আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটির স্বরূপে জন্মলাভ করব।

উদ্ধবের মতো মহান ভক্তও ব্রজগোপিনীদের চরণরেণু গ্রহণের জন্য—বৃন্দাবনের গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি হয়ে জন্মলাভ করতে চেয়েছেন।

গোপিনীভাব মধুরভাব—রূঢ়ভাব। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়—তাই রূঢ়ভাব। 'রূঢ়'-'অধিরূঢ়' ভাব—কেবলমাত্র মধুর-ভাবেই বিদ্যমান।

রামেন সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্ত চিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ—
তীব্রাধয়োন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥

—১০ উদ্ধব-সংবাদ

অক্রুর ও বলরামের সাথে আমাকে (কৃষ্ণকে) মথুরায় নিয়ে গেলে আমাতে অতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত-চিত্তা গোপীগণ তৎকালে আমার বিরহজনিত তীব্র ও দুঃসহ মনস্তাপে তপ্ত হয়ে একমাত্র আমার সমাগম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকেই সুখকর রূপে দর্শন করেন নাই।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবন গোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবু ॥ —১১ উদ্ধব সংবাদ

হে উদ্ধব, পূর্ব্বে বৃন্দারণ্যে আমার (কৃষ্ণের) অবস্থানকালে তাঁরা (ব্রজললনাগণ) প্রাণ-প্রিয়তম স্বরূপ আমার সাথে যে সকল রাত ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় সুখে অতিবাহিত করেছেন, আমার বিরহে সে সকল রাতই গোপিনীগণের নিকট কল্পতুল্য সুদীর্ঘ মনে হয়েছিল।

পৌর্ণমাসীও নন্দীমুখীকে বলেছিলেন, রাসবিষয়ে শরৎকালীন সেই রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সদৃশ হ'লেও, গোপীগণের কাছে সেই রাত্রি নিমেষ হ'তেও অল্প বোধ হয়েছিল। এরূপ বোধ হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ-সংম্বন্ধীয় সুখোৎসেক আরম্ভ হ'লেই মহাকল্পাবধি কালসংখ্যাও নিমেষ-তুল্য প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্রজগোপিনীগণের কৃষ্ণসঙ্গে কল্পকাল অবস্থানও ক্ষণার্দ্ধবৎ এবং কৃষ্ণবিরহে ক্ষণার্দ্ধকালও কল্পসম প্রতীত হয়েছিল—

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যঘশত্রো
সা ক্ষণার্দ্ধবদগাত্তব সঙ্গে।

হা ক্ষণার্দ্ধমপি বল্লবিকানাং
ব্রহ্মরাত্রিততি বদ্বিরহেহভূৎ ॥

—ভঃ রঃ সিঃ দঃ
বিঃ ১লঃ ১১৩ শ্লো

গোপীগণ বললেন—হে অঘনাশন (রাসস্থলীতে) তোমার মিলনকালে বল্লবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি-সকলও ক্ষণার্দ্ধতুল্যের ন্যায় বিগত হয়েছিল। হায়! এখন তোমার বিরহে ঐ বল্লবীবৃন্দের ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রহ্মরাত্রি সমূহের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হচ্ছে।

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র—
লীলাবলোকপরিরম্ভণ রাসগোষ্ঠ্যাম।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনাতং
গোপ্যঃ কথংন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্।

—ভাঃ ১০।৩৯।২৯

অক্রুর-দর্শনে গোপীগণ পরস্পর মন্ত্রণা করে বলছিলেন—হে সখিগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের সানুরাগ মধুরহাস্য, সঙ্কেতবার্ত্তা, লীলাসহ দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাসসভায়—আমি মিলন রাতগুলোকে ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করেছি, এখন তাঁর অভাবে এই দুস্পার বিরহদুঃখ কিরূপে উত্তীর্ণ হ'বো বলতে পারো?

'যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখে বহুরাত্রি ক্ষণতুল্য বোধ হয়েছিল, সেইরূপ বিরহ দুঃখে ক্ষণকালও আমাদের কাছে যুগসহস্র বলেই মনে হবে।' —শ্রীল বিশ্বনাথ।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণের জন্য সখাগণ সহ সামান্য দূরেও গমন করতেন—সেই ক্ষণকালের অদর্শনও কৃষ্ণ বিরহ ব্যাকুল গোপীগণের কাছে যুগ বলে প্রতীয়মান হ'তো।

"অটতি যদ্ভাবনহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ॥

—ভাঃ ১০।৩১।১৫

হে প্রিয়তম, দিবাভাগে গোচারণের জন্য যখন তুমি বনে যাও,

তখন তোমাকে না দেখে ক্ষণকালও আমাদের কাছে এক যুগ বলে মনে হয়।

পরমভাগবত শ্রীশুকদেবও কৃষ্ণবিরহ ব্যাকুল ব্রজগোপীগণ সম্বন্ধে বলেছেন :—

'ক্ষণং—যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা-ভবেৎ ॥'

—ভাঃ ১০।১৯।১৬

অর্থাৎ কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণের নিকট ক্ষণকালও শত যুগের মতো মনে হয়।

গোপীগণ একান্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পন করেছিলেন :

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ—
ধিয়ঃ স্বমাত্মনমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥

—উদ্ধব সংবাদ

সমুদ্র প্রবিষ্ট নদীগণের ন্যায় মুনিগণ যেরূপ সমাধিযোগে নামরূপ জানেন না, গোপীগণও সেইরূপ আমাতে (কৃষ্ণেতে) এভাবে চিত্ত সমর্পণ করেছিলেন যে—নিজদেহ, ইহলোক বা পরলোকের বিষয় কিছুই জানতে পারেননি।

মোহাদির অভাবেও সমস্ত বিস্মরণ সম্ভব—ইহা বিগাঢ়ভাবের উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে নির্দ্দেশিত অন্য এক অনুভাব।

আমাতে অনুষঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ সঙ্গ দ্বারা যাদের ধী বদ্ধা তাঁরা। এক্ষেত্রে বদ্ধ' পদটি দ্বারা কৃষ্ণ ত্রিজগন্মোহন বিচিত্র লীলার স্তম্ভ অনুষঙ্গ বলবৎধাম, ধী-বৃত্তি কৃষ্ণ বাঞ্ছিত—সম্পাদক—কামধেনু—ঘট —এরূপ আরোপ হয়েছে।

গোপীগণ স্বীয় আত্মা অর্থাৎ দেহকে জানেন না, রাসাভিসারাদিতে কোথায় রয়েছেন, কোথায় আসছেন—এসকল কোন কিছু সম্বন্ধেই ভাবেন নি। সেরূপ উহা বা পরলোক ধর্ম্মের অতিক্রম হেতু। ইহ-লোকলজ্জা ভয়াদি অতিক্রম করে—এই ভাব।

একান্তর

সমাধিতে মুনিগণের—যেমন সর্ব্ব বিস্মরণে ব্রহ্মানুভব—সেইরূপ ব্রজগোপিণীগণের আমার (কৃষ্ণের) অনুভব ইহা সর্ব্ববিস্মরনাংশে দৃষ্টান্ত, কিন্তু প্রাপ্যাংশে নয়।

কারণ গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম এবং মুনি-প্রাপ্য নির্ব্বাণ—এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। যেহেতু তাদেব মাধ্যে মমত্ব ও অমমত্ব ভেদ বিদ্যমান।

সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তক পবমাহ্লাদপ্রদ দৃশ্যমান চন্দ্র অপেক্ষা সর্ব্বগুণ-হীন হ'লেও পতিপুত্রাদি যে অধিক সুখ প্রদান কবে—সেক্ষেত্রে মমতাই যদি এরূপ ভাবের কাবণ হয়, তবে সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত চিরন্তন সুখপ্রদ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি গোপীগণেব মমতা যে সুখ ও আনন্দের কাবণ হবে—তা আর বিচিত্র কি?

রাসাদি-অভিসাবে গোপীগণেব অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবতে বিশেষ বর্ণনা বয়েছে ঃ—

দুহন্ত্যোঽভি যযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপবা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

—ভাঃ ১০।২৯।৫-৭

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুগ্ধ দোহন কবছিলেন, তখন কৃষ্ণগীত (বংশীধ্বনি) শ্রবণে, স্বীয় কার্য্য পবিত্যাগ করে অভিসারে যাত্রা করলেন, কারো বা চুল্লীর ওপর দুগ্ধ ছিল—সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল—কেহ বা চুল্লী হ'তে অন্নপাত্র না নামিয়ে যাত্রা করলেন। কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনগণকে খাদ্যাদি পরিবেশন করছিলেন, কেউ বা শিশুপুত্রকে স্তন্যপ্রদান করছিলেন, কেউ বা পতিসেবায় রত ছিলেন, কেউ কেউ ভোজন, অঙ্গরাগ, শরীরমার্জনাদিতে রত ছিলেন, কেউ কেউ চোখে কাজল পরছিলেন—কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁদের সকল

কাজ অসমাপ্ত রেখেই বিপরীত ভাবে বসনভূষণাদি ধারণ করে—একমাত্র পুরুষ ও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও গোপিনীগণের ঐ অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥

মুনিগণ যেমন সমাধিতে উপাধিআদি সর্ব্ব বিস্মরণে ব্রহ্মানুভব করেন, ব্রজবালাগণও তেমন পতি-পুত্রাদি, লোকধর্ম্ম ইত্যাদি বিস্মৃত হয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল অনুভব করেন।

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥ —উদ্ধব-সংবাদ

আমার (কৃষ্ণের) স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়েও রতিসুখপ্রদ জারজ্ঞানে আমাকে কামনা করেই সেই সকল গোপীগণ আমার সঙ্গগুণে পরম ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই একান্তভাবে লাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণ বিষয়ক কাম অন্যকাম বিনাশী, অথচ কৃষ্ণকাম প্রবর্দ্ধনকারী।

মৎকাম শনকৈং সাধু সর্ব্বান্ মুঞ্চতি ইচ্ছায়াম্॥ —ভাঃ ১।৬।২৩

আমাতে অনুরাগ বিশিষ্ট হ'লেই—সাধু পুরুষগণ হৃদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগে সমর্থ হন্।

"ব্রজললনাগণ এই প্রকার প্রেমবতী যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণাকর্ষক হয়েও এবং স্বয়ং সর্ব্বসুখ পরিপূর্ণ হয়েও—স্বসুখার্থে তাঁদের (ব্রজবালাগণের) সাথে রমণে নিরত হয়েছিলেন।"

—শ্রীল বিশ্বনাথ।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি বলে তাঁরা

তাঁরই (শ্রীকৃষ্ণেরই) আত্মভূত। অতএব তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রমণ একান্তভাবেই সম্ভব। ভগবানের নিজাত্মা থেকেও—ভক্তগণ তাঁর কাছে অধিক আনন্দপ্রদ। গোপীগণ সর্ব্বভক্ত শিরোমণি বিধায় আত্মারাম স্বয়ং ভগবান অধিক আনন্দপ্রাপ্তি হেতু তাঁদের সাথে রমণে নিরত হয়েছিলেন।

"তামেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।"

গোপীগণ একমাত্র পুরুষ ও পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি স্বরূপেই লাভ করেছিলেন।

তাই পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপীগণ জার বুদ্ধিতেও পরমাত্মা শ্রীহরির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

ব্রজবালাগণ মাধুর্য্য বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই একান্তভাবে জানেন, কিন্তু তাঁর বিলাসমূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণকে জানেন না। জানবার প্রয়োজনও ছিল না।

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্য না জানয়॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপুচ্ছ-গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন॥
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহাব॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭ পঃ

গোপীগণ কৃষ্ণ বিনা আব কিছু জানতেন না, জানতেও চাইতেন না। জানার প্রয়োজনও ছিল না তাঁদের।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ॥
নারায়ণ কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় নারায়ণে॥'
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে॥

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশে যদি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করতেন—গোপীগণের রাগোদয় সেইমূর্ত্তি দর্শনে সঙ্কুচিত হ'তো। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজনশীল দুর্গম পারকীয় পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন মহান্ পণ্ডিতের পক্ষেও বোঝা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

নিম্নলিখিত শ্লোকেই উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য্য বিদ্যমান।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষো ভাবস্য

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ
প্রক্রিয়াম্॥
আবি কুর্ব্বতি বৈষ্ণবী মপি তনুং তস্মিন্
ভুজৈর্জিষ্ণভি।
যাসং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুত রুচিং রাগোদয়
কুঞ্চতি॥

যদি কেউ প্রশ্ন করেন রাসস্থলী থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরও গোপীগণ তাঁর বিরহে গমন, হাস্য ও আলাপাদি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যমূর্ত্তি ধারণ এবং তদীয় বিহার ও বিভ্রম লাভ করে কৃষ্ণাত্মিকা হয়েছিলেন। এবং পরস্পরের কাছে 'আমিই সেই কৃষ্ণ এরূপ জ্ঞাপন করেছিলেন কেন? এবং তাঁদের এ ধরণের আচরণে সমানরূপতা বিষয়ে তাঁরা যে অনভিজ্ঞ তা মনে হয় না' তো?

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে।

অধিরূঢ় মহাভাব—দুইত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
'উদঘূর্ণা' চিত্রজল্প'—মোহনে দুইভেদ॥
উদঘূর্ণা, বিরহচেষ্টা—দিব্যোন্মাদনাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান"॥

—চৈঃ চঃ ম ২৩ প

দিব্যোন্মাদের পৌঢ়াবস্থায় যদিও গোপীগণ কৃষ্ণ বিরহে 'ঐ কৃষ্ণই

পঁচাত্তর

আমি', 'আমিই সেই কৃষ্ণ'—কৃষ্ণ আমি' এই রসাস্বাদ-ে অবস্থা পেয়ে তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন—কিন্তু অংহগ্রহোপাসনাবশে তাঁরা ঐ ধরনের উক্তি করেন নাই।

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ'—ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেছেন—"কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাগণের মধ্যে প্রত্যেকে ভাবলেন যে, এক্ষণে আমি স্বরূপ চেষ্টাদি অণুকরণের দ্বারা নিজেকে কৃষ্ণাকার প্রতিভাত করে অন্য বিরহকাতরাগণ ও নিজের মুহূর্তকালও নির্বৃতি নিষ্পাদন করব—এই মনোভাবের দ্বারা সঞ্চালিত হয়েই তাঁরা কৃষ্ণের সকল লীলা ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে এনেছিলেন। এমনকি পুতনাবধ লীলাও করেছিলেন। অতএব সেই লীলায় প্রতিকূল সমূহের অনুকরণ যোগমায়াই তন্মধ্যে গোপীস্বরূপা হয়ে সেই সেই লীলা সিদ্ধিব জন্য এরূপ করেছিলেন, কিন্তু অনুকূলের অনুকরণ গোপীগণ করেছিলেন এরূপ ভেবে নিতে হবে।'

অবশেষে তিনি 'এবং কৃষ্ণ পৃচ্ছমানা' শ্লোকেব টীকার প্রারম্ভে বললেন—"বিপ্রলম্ভের উন্মাদ অবস্থার চরম-সীমায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় স্বপ্রেষ্ঠ তাদাত্ম্যই হওয়া স্বাভাবিক।"

গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। সুতরাং তাঁরা স্বদেহেব স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁবা কেবল শ্রীকৃষ্ণেব সৌন্দর্য্যানুভাবে প্রমত্তা।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন—গোপীগণ যখন অনেক সময় নিজ নিজ দেহের সংস্কার সাধন ও ভূষণাদি ধারণ করেছেন—তখন স্ব-দেহ প্রীতি তাঁদের থাকবে না কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই পাওয়া যাবে—

'তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥ —চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ

গোপীগণের স্বরূপ সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অত্যন্ত দুরধিগম্য এই তত্ত্ব।

'এবং পরিষঙ্গ-করাভিমর্শ—
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাস—হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি—
যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব—বিভ্রমঃ॥

—ভাঃ ১০।৩৩।১৬

পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেইরূপ লক্ষ্মীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, উদ্দাম বিলাস ও হাস্য সহকারে ব্রজললনাগণের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হয়েছিলেন।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে
ভবন্তিন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং।
মন্মনোগতম্
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি
তত্ত্বতঃ॥

—আদিপুরাণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ, গোপীগণ আমার সর্ব্বস্ব। তাঁরা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, তাঁরা আমাকে গুরুস্বরূপেও স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, তাঁরা বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত স্বরূপে ব্যবহার করেন। আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব একমাত্র গোপীরাই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ তথ্য আর কেউ জানে না।

"সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।"

—পদ্মপুরাণ

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বা গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাই সার কথা। গোপীতত্ত্বজ্ঞান না থাকলে—পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা সম্ভব নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখেই স্বীকার করেছেন—গোপীগণ আমার সর্ব্বস্ব।

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম' প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব' ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার ॥

আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥" —চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ

কৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক এবং উভয় তত্ত্বই দুর্জ্ঞেয়। পরম প্রেমময়ের করুণা ছাড়া এ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীভাবকেই সর্ব্বোচ্চ বলেছেন:

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয় ॥

* * * *

পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর রসে শৃঙ্গার ভাবের প্রাবল্য ॥
শান্ত রসে শান্ত রতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ' সীমা।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥

* * * *

'রূঢ়' 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল মধুরে ॥ —চৈঃ চঃ ম ২৩

রাধারাণী এবং ব্রজগোপিণীগণেরই মধুরভাবে অধিকার। মধুরভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব। রাগানুগা ভজনকারী বৈষ্ণবগণ মধুরভাবে—সখিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার সঙ্গিণী। এই ভাবই—মহাভাব। এই ভাবের ওপরে আর কোন ভাব নেই।

গোপীভাবের সর্ব্বোত্তমা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরম আশ্রয়। রাধিকার প্রেমেই চিরসুবদ্ধ হয়েছেন স্বরাট, স্বাধীন এবং আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ। গোপীগণ তথা শ্রীরাধার কাছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র সুবদ্ধই নন্—বিশেষ ভাবে ঋণী।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। —গীতা

যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে তদ্ভাবেই ভজনা করে থাকি।

সত্যপর, সত্যব্রত; সত্যসঙ্কল্প ভগবান—শ্রীকৃষ্ণলীলায় উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সমর্থ হন্‌নি।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও ঐ একই কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সহজভাবে বললেন ঃ—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ বচনে॥

গোপীগণ তথা মহাভাবময়ী শ্রীরাধা যে ভাবে কৃষ্ণের ভজনা করেছেন, স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তদ্ভাবে কৃষ্ণলীলায় গোপীগণের ভজনা করতে সমর্থ হন্‌নি। অচিন্ত্যশক্তি বিশিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে কেবল শ্রীরাধিকার তথা গোপীগণেব ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়েছিলেন।

তাই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ঋণ শোধ করতে বাধ্য হন্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান—তাই শুধুমাত্র ঋণ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হন্‌নি—শ্রীবাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি ভাব ও বর্ণে স্বীকার কবে; অন্তরে ও বাইরে প্রেমময়ী শ্রীবাধার তন্ময়তায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রেমাস্বাদনে উন্মত্ত হয়ে—সেই প্রেম পসরার ডালি সর্বত্র বিতরণ করলেন।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
শ্রীরাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

নিজ প্রেমস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তব মন ধায় ॥

* * *

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণ-দ্বারে ॥
রাধা-ভাব অঙ্গে করি, ধরি, তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৪র্থ পঃ

তাই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব (তথা গোপীতত্ত্ব)—গৌরতত্ত্বে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর রূপ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ যাঁর স্বরূপ, শ্রীমদদ্বৈতরূপে যিনি ভক্তাবতার, শুদ্ধ ভক্ত শ্রীবাস আদি রূপে যিনি ভক্তাখ্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগদাধররূপে যিনি ভক্তশক্তি—সেই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অধার্ম্মিকগণের এবং দৃপ্ত ছল রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্ত হয়ে ধরণী দেবী কাতরা হয়ে পড়েছিলেন।

ধরণী দেবী তৎপরে গোরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার শরণ নেন। এবং ব্রহ্মার কাছে করুণ কণ্ঠে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে—আপন দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেন। ধরণীদেবীর কাতরতা লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বিচলিত করে—তিনি মহেশ্বর ও অন্য দেবগণের সঙ্গে ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে গমন করেন।

তাঁরা তথায় সম্মিলিতভাবে স্থিরচিত্তে পুরুষ সূক্তদ্বারা বাঞ্ছাকল্পতরু বিঘ্নবিনাশন পুরুষাবতার জগন্নাথের উপাসনা করেন।

একাদ

ব্রহ্মা সমাহিত অবস্থায় আকাশবাণী শুনতে পান। এবং দেবগণের কাছে সেই বাণীর বিবরণ প্রদান করেন :

'হে দেবগণ, তোমরা আমারই মুখ হ'তে ক্ষীরোদশায়ী সেই পরম পুরুষের বাণী শ্রবণ কর এবং তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। ধরণীর দুঃখভারের কথা আমরা নিবেদন করার বহুপূর্ব্বেই—তিনি ধরণীর অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত। নিখিলেশ্বর ভগবান্ তাই ভূ-ভার-হরণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হবেন বলে স্থির করেছেন। তাই তোমরা ভগবদংশভূত পার্ষদগণ সহ যদুকুলে আবির্ভূত হও। দেবপত্নীগণও পরম পুরুষের তোষণের নিমিত্ত ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হ'ন।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবাসুদেব স্বয়ং বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হবেন।

সহস্রবদন শ্রীসঙ্কর্ষণও তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই সেবার জন্য আগে আবির্ভূত হবেন। যে মায়াদ্বারা—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয়বিধ জগৎ মোহাবিষ্ট—সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়াও ভগবানের আদেশে প্রাদুর্ভূত হবেন।'

ব্রহ্মা দেবগণকে উপরোক্ত নির্দ্দেশ দিলেন এবং ধরণী দেবীকেও নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করে ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন।

লীলারত ও সত্যব্রত ভগবান্ তৎপরে সপার্ষদ পৃথিবীতে আপন অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় মর্ত্ত্য লীলাবিলাসের দ্বারা ত্রিলোকবাসী জীবগণকে স্বচরণে সমাকর্ষণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকারী জগদ্গুরু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :—

যস্যাননং মকরকুণ্ডল চারুকর্ণ—
ভ্রাজৎ কপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ॥

—ভাঃ ৯।২৪।৬৫

যাঁর মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস—এই সমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষু দ্বারা পান করে নরনারী পরমানন্দিত হ'তেন এবং দর্শন বাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হ'তেন।

অতুলনীয়, অদ্ভুত দর্শন শ্রীকৃষ্ণ 'অতি সুন্দর দর্শন।' অতি সুন্দর দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'অতৃপ্ত নয়নে' দর্শন করেছিলেন, কৃষ্ণমূর্তি এমনই মনোহর যে বারবার দর্শন করেও তাঁদের নয়ন তৃপ্ত হয়নি।

যা নিত্য-নূতন, প্রতিবার দর্শনে যা নূতনরূপে প্রতিভাত হয়—তাকে দর্শন করে কেউ কখনও তৃপ্তিলাভ করতে সমর্থ হয় না, বরং দর্শনের অভিলাষ ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় মধুরতম শ্রীমূর্তি নিত্য-নূতন বিধায় দেবগণ তদ্দর্শনে তৃপ্তিলাভ করতে সমর্থ হন নি।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরূপ সর্ব্বমনোহর শ্রীমূর্তি প্রকট করেছিলেন যে, তিনি নিখিল লোক-লাবণ্য বিজয়িনী স্বীয় অঙ্গ প্রভাদ্বারা মানবগণের নয়ন আকর্ষণ করেছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ দর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য দর্শনে অপ্রবৃত্তির উদয় হয়েছিল।"

—ভাঃ ১।১।৭

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে শুকদেব কৃত "যস্যাননং ……নিমেশ্চ॥" শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিজ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলেছেন:

সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণবপু—সিংহাসনে, বসি' রাজ্যশাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি'—মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥

কর নখ চান্দের ঠাট, বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ—চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু, নেত্র – বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে ; কাঁহারে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥
বিপুলায় তারুণ, মদন—মদ-ঘূর্ণন।
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য—কেলি-সদন, জননেত্র রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ-দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পানে ?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ পিতে নারে, মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥
না দিলেন লক্ষকোটি সবে দিলা আঁখি দু'টি
তাতে দিলা নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

'অতি সুন্দর দর্শন' শ্রীকৃষ্ণকে দু'চোখে দেখে তৃপ্তি হয় না

যদি লক্ষ কোটি চোখ হ'তো—এবং সে সকল চোখে যদি পলক না পড়ত—তবুও শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ দেখে নয়ন তৃপ্ত হ'তো কিনা সন্দেহ। যিনি প্রতি মুহূর্তে নূতন—বারবার লক্ষ কোটি চোখ দিয়ে তাকে দেখলেও দর্শন তৃষ্ণা মেটে না।

অপরের কথা স্বতন্ত্র, স্বয়ং কৃষ্ণও স্বীয় মোহন মূর্তি সন্দর্শনে অতৃপ্ত হয়েছিলেন। মনোহর কৃষ্ণমূর্তি দর্শনে' অন্যের অতৃপ্তি তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ—
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ —ভাঃ ৩।২

অর্থাৎ —ভগবান্ স্বীয় যোগমায়াবলে প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় —মূর্তি প্রকট করেছেন। সেই মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী। তাহা এতই মনোরম যে, সে মূর্তি দর্শনে —কৃষ্ণের নিজেরই বিস্ময়োৎপাদন হয়। তা' সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমগ্র ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে পরম অলৌকিক।

—ভগবান, তাঁর ধাম, তাঁর পরিকর এবং তাঁর বিহারকাল সকলই অনন্ত এবং অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট। সাধারণের দুরধিগম্য।

মাতা যশোদা যে শিশু কৃষ্ণকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করে আদর করতেন—শ্রীকৃষ্ণের উদরেই আবার তিনি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছেন। শিশু কৃষ্ণের যে পরিমিত কটিদেশ অনতিদীর্ঘ কিঙ্কিনী বেষ্টন করেছিল, কিন্তু সেই শিশুরূপী ভগবানকে বন্ধন করবার মানসে গৃহের এবং নন্দব্রজের সকল গৃহস্থিত দাম সমূহ সংগ্রহ করেও বন্ধন করা সম্ভব হয়নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে—বন্ধনকালে শিশু কৃষ্ণের উদরটি তিলমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি।

যে ষোলক্রোশী বৃন্দাবন প্রদেশে —কৃষ্ণ অসংখ্য গোবৎস চরাতেন—সেই বৃন্দাবনের এক এক প্রদেশেই ব্রহ্মা পঞ্চাশৎ-কোটী যোজন প্রমাণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন।

রাসলীলার প্রহর চতুষ্টয়াত্মক এক রজনীতেই যুগ সহস্র পরিমিত কাল প্রবেশ করেছিল।

—কৃষ্ণকর্তৃক কংস নিহত হ'লে, কংসপত্নীদ্বয় পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করেন, এবং তাঁদের বৈধব্যের কারণ পিতার নিকট বর্ণনা করেন। জরাসন্ধ শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবী যাদবশূন্য করবার মানসে—অপরিমিত সৈন্যসহ ক্রমাগত সপ্তদশবার মথুরা অবরোধ করেন। অষ্টাদশবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং নারদ কর্তৃক প্রেরিত কালযবনও যুদ্ধার্থী হয়ে তিনকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য সহ মথুরা অবরোধ করল।

সঙ্কর্ষণ সহায় কৃষ্ণ কালযবনের মথুরা অবরোধে এবং জরাসন্ধ কর্তৃক পুনরায় মথুরা আক্রমণের সম্ভাবনা থাকায়—তদাশ্রিতগণের বিপদ চিন্তা করে ভাবলেন, অদ্যই এক দ্বিপদ দুর্গ রচনা করে তন্মধ্যে আত্মীয় স্বজনগণকে আশ্রয় দান করে—কালযবনকে হত্যা করব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মনে মনে চিন্তা করে সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ এবং তন্মধ্যে এক আশ্চর্য্যজনক নগর নির্মাণ করলেন।

ঐ নগরে বিশ্বকর্ম্মার যাবতীয় শিল্পকর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়েছিল। উদ্যান-সমূহ সুশোভিত ছিল, যথাযথ রূপে রাজপথাদিও নির্ম্মিত হয়েছিল। স্বর্ণময় অট্টালিকাদিও উক্ত নগরে বিদ্যমান ছিল। ঐ নগরটি চতুর্ব্বর্ণ লোক পরিপূর্ণ ছিল—এবং রাজগৃহ সমূহ সর্ব্বোপরি শোভমান হয়েছিল।

দেবরাজ ইন্দ্র—সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা এবং পারিজাত, বরুণদেব—অতি বেগবান শুক্লবর্ণ অশ্বসকল, কুবের—পদ্ম প্রভৃতি অষ্টকোশ এবং অন্যান্য লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় বিভূতি উপঢৌকন

দিয়েছিলেন। অন্যান্য সিদ্ধগণও শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকেই পাওয়া নিজ নিজ সিদ্ধি সমূহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেছিলেন। ঐ নগরে অবস্থিত মনুষ্যগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি মর্ত্যধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হ'তেন না। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে মথুরা থেকে ঐ নবনির্ম্মিত দ্বারকাপুরে আনয়ন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও উপরোক্ত বিবরণের সততা স্বীকার করা হয়েছে—

স্বযুপ্তান্মথুরায়ান্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ।
উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ॥
প্রবুদ্ধ তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদ্বার সমন্বিতাঃ।
হৈম—হর্ম্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন মথুরায় নিদ্রিত পৌরজনকে রাত্রিকালে আকস্মিকভাবেই দ্বারকায় এনেছিলেন। সেই সকল মথুরাবাসীগণ জাগ্রত হয়ে পুত্রপরিবার সমন্বিত অবস্থায় নিজেদেরকে স্বর্ণভবনে অবস্থিত দেখে পরম বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

* * *

তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল তাঁকে আন্তরিক ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করলে—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট আবদ্ধ হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম মলিন বসন পরিহিত ক্ষীণকায় ভক্ত 'সুদামা' এক সময়ে 'ক্ষুদকণা' নিয়ে বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় এসেছিলেন এবং কৃষ্ণেচ্ছায় ষোড়শসহস্র মহিষীগণের অবস্থানক্ষেত্র অন্তঃপুরে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরুক্মিনী দেবীর মন্দিরে দরিদ্র ও মলিন বসন পরিহিত সুদামা প্রবেশ করেছিলেন।

সেই সময় প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকে সুদামাকে আসতে দেখে—গাত্রোত্থান* করে আগে এগিয়ে গিয়ে সুদামাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। প্রিয়সখা সুদামার সুখস্পর্শে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের নয়ন থেকে আনন্দাশ্রুও ঝরে পড়েছিল। এবং

স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত সুদামাকে নিজ পর্য্যঙ্কে বসিয়ে যথোচিত সেবা করেছিলেন। শ্রীরুক্মিণী দেবীও পতির আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে— ভক্ত সুদামাকে চামর দ্বারা ব্যজন করেছিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণ-ভক্ত সুদামা দ্বারকা থেকে স্বগৃহে ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন—

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥

—ভাঃ ১০।৮১।১৫-১৬

অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বচক্ষে দর্শন করেছি। কারণ বক্ষদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করেও— তিনি আমার মতো অতি দরিদ্রকে (লক্ষ্মীহীনকে) সেই বক্ষদ্বারা আলিঙ্গন করেছেন।

আমার মতো দরিদ্র পাপীজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা এই ব্রাহ্মণাধমকে আলিঙ্গন করেছেন।

সূতিকাগৃহে আবির্ভূত ভগবানের উদ্দেশ্যে দেবকী দেবী বলেছেন—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্ত বন্ধো
চেষ্টা মাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদি বৎসরান্তো মহীয়াং
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥

—ভাঃ ১০।৩।২৬

—হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হয়ে চলছে, নিমেষ থেকে বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বসংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ আপনার চেষ্টা বা লীলামাত্র বলে বর্ণনা করেন। আপনি সমগ্রের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলময় কারণ, আমি আপনাতে প্রপন্ন হই।

জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করেও বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে আবদ্ধ নন্, অধিকন্তু তাঁর চিৎশক্তি-সমন্বিতা ষোড়শসহস্র মহিষীগণের বিচিত্র হাবভাবেরও বশীভূত নন্ তিনি। কিন্তু প্রেমবতী সত্যভামার প্রার্থনায় তিনি পারিজাত আহরণ লীলায় নিরত হয়েছিলেন, তা কামবশে নয়—তা কেবল প্রেমবশ বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ব্রজললনাগণ অত্যধিক প্রেমবতী বলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ ও বাধ্য করেছেন। প্রেমের পরিমাণ অনুযায়ীই শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বাধ্যতা।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর ত্যাগকালে কুলনারীগণ পরস্পর আলাপ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
> সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীত পাণিভিঃ।
> পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু—
> ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ॥

—ভাঃ ১।১০।২৮

হে সখি,—যে অধরামৃতের আশায় ব্যাকুলচিত্ত ব্রজবালাগণ সম্মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন—সেই অধরসুধাই যারা বারবার পান করে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল পাণিগৃহীতা পত্নীগণ এই বিশ্বাত্মা কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিবিধ বহুব্রত, স্নান ও হোমাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূজা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের পরিচয়ও মহাকৌর্ম্মে বিদ্যমান।

> অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
> ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম॥

—মহাকৌর্ম্মে।

মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে জগদ্যোনি, বিভু, অজ একমাত্র পুরুষ ও পরম পুরুষ বাসুদেবকে স্বামিরূপে লাভ করেছিলেন।

ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যাস্তত্র সমাগতাঃ।
হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥
তস্যৈতা শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥
সম্পূর্ণ মণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শীকলা।
ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাঙ্গনে॥
একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক পৃথক।

—স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে

অর্থাৎ ষোড়শসহস্র গোপী তথায় সমাগত হ'লেন। পরমাত্মা জনার্দ্দন কৃষ্ণ হংসসদৃশ। হে দেবি, এঁরা (গোপীগণ) তাঁরই ষোড়শ শক্তি বলে পরিচিত। কৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, তাঁরা তাঁরই কলা রূপ। হে বরাঙ্গনে, তাঁরা সম্পূর্ণ মণ্ডল। মালা আকারে ষোড়শকলা, যাঁরা ষোলটি কলা তাঁরা গোপীরূপা। এক এক কলা সহস্র সহস্র সংখ্যায় ভিন্ন হয়ে পৃথক্ পৃথক।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি। শুধু তাই নয়, তাঁরাই আবার গোপীগণের অন্যতর প্রকাশ। কারণ পাদ্মে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

'কৈশোরে গোপকন্যা-স্তা যৌবনে রাজকন্যাকাঃ।'

অর্থাৎ কৈশোরে যারা গোপকন্যা ছিলেন, যৌবনে তাঁরাই রাজকন্যা।

সুতরাং পূর্ণতম ব্রজেন্দ্রনন্দনের অন্যতর প্রকাশ যেমন দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে হ্লাদিনীশক্তি গোপীগণেরও অন্যতর প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণের মধ্যে।

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভুদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

—ভক্তিরসামৃত—শ্রীবিশ্বনাথ

অধিকন্তু পট্টমহিষীগণও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিধায়—তাঁদের কটাক্ষাদিতে প্রাকৃত প্রাকৃত কামভাবের বিদ্যমানতা নাই।

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস—
ব্রীড়াবলোকনিহতোঽমদনোঽপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমোদত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ।
তমযং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানাং যতোঽবুধঃ॥

—ভাঃ ১।১১।৩৬।৩৭

যে সকল পরমা সুন্দরীগণের গূঢ় হাব-ভাব-সূচক নির্ম্মল মনোহর হাস্য ও সলজ্জ অপাঙ্গ-নিক্ষেপে নিতান্ত মোহিত কামের রিপু সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহপ্রাপ্ত হয়ে পিনাকধনু পরিত্যাগ করেন বা স্বয়ং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে লজ্জাক্রমে কুসুমধনু পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ মহেশ-মদন-বিজয়িনী, বরবর্নিণী ললনাশ্রেষ্ঠগণও কপট হাব-ভাব-বিক্রমাদি দ্বারা যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করতে সমর্থ হন্‌নি, সেইরূপ নির্বিকার, প্রাকৃত-সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে অতত্ত্বজ্ঞতাহেতু—এই সকল প্রাকৃত মায়ামুগ্ধ লোক নিজেদের ন্যায় কাম ব্যাপার যুক্ত প্রকৃতিসঙ্গী সামান্য মর্ত্ত্য মনুষ্য বলে ভ্রম করে।

এ ব্যাপারে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলেছেন, পত্নীগণ করণ-সমূহের দ্বারা বিশেষভাবে মথনে সমর্থ হননি।……প্রেমাংশের পরিমাণে মথনে সমর্থ হয়েছিলেন মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে কাম প্রবেশের সম্ভাবনাও নাই ঃ—

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে দহন্ত্যা সহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি,
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃশ্রয়তে॥

—ভাঃ ২।৭।৭

ব্রহ্মা নারদকে বললেন, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন বটে—কিন্তু সেই রোষের দ্বারা তাদের চিত্তই দগ্ধ হয়ে থাকে, তাঁরা প্রকৃতই কামকে দগ্ধ করতে সমর্থ হন্‌

না ; কারণ তাঁরা নিজেদের রোষে নিজেরাই অভিভূত হয়ে পড়েন, কিন্তু সেই রোষ ভগবানের অমল অন্তঃকরণে প্রবেশ করতে ভয় পায়, সুতরাং তাঁর মনে কাম কিরূপে আশ্রয় করবে ?

পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন :

তাসামবিরভূচ্ছৌরি : স্ময়মানাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ —ভাঃ

সেই ক্রন্দনরতা গোপীগণের মধ্যে হাস্যবদন, পীতবসন, বনমালী, সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন ।

চড়ি, গোপী-মনোরথে মন্মথের মন-মথে,
নাম ধরে মদনমোহন ।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাগ করে লঞা গোপীগণ ॥

—চরিতামৃত মঃ ২১ পঃ

'বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত—নবীন মদন' ।
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম ॥
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তবে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বর্গ থেকে পারিজাত হরণ করে এনেছিলেন, এবং বজ্রপাণি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন—এতে পারিজাত আনয়নের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যতাই প্রকাশ পায় নাকি ?

এ সম্পর্কে শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন—এই কাজের দ্বারা প্রাকৃত চোখে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত কামীর ন্যায় মনে হ'লেও—তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতকামী নন্। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির বশ। তিনি সত্যভামার অপ্রাকৃত প্রেমে বশীভূত হয়েই—সেবিকার প্রীতিসাধন-মানসে পারিজাত আনয়ন করেন। ইন্দ্র স্বীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে ভক্তের ভক্তিবশ সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যমাত্র লোভে জড় কাম-বশ অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মায়াধীশ ভগবান্ জীবের প্রতি পরম করুণাবশে লোক উদ্ধার-হেতু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'লেও মায়ামুগ্ধ ভাগ্যহীন জীব তাঁর সমস্ত ভূতের সঙ্গে মহেশ্বরত্ব এবং তাঁর পরম ভাব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না। এমন কি, অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট ঐ ভগবানকে প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণের অন্যতম বিচার করে অবজ্ঞা করে থাকেন।

একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥

—গীতা ৯।১১

ভগবন্মায়া কেবলমাত্র মর্ত্ত্যবাসী জীবগণের প্রতিই প্রভাব বিস্তার করে ক্ষান্ত নয়, দেবগণের ওপরেও স্বপ্রভাব বিস্তারে সমর্থ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপতনয় বোধে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং গো-পাল ও গোবৎস হরণ করেছিলেন।

শিব স্বভক্ত বাণরাজার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন।

ইন্দ্র—স্বযজ্ঞভঙ্গ ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞারম্ভে সামর্থ্যানুযায়ী প্রলয় মেঘবর্ষণ করেছিলেন। এবং পারিজাত হরণের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

অগ্নি—দাবানলরূপে নিদ্রিত ব্রজবাসীগণকে দাহ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বরুণ—কৃষ্ণপিতা নন্দ রাজাকে ভৃত্য দ্বারা অপহরণ করেছিলেন। এবং অন্যান্য দেবগণও নানাবিধভাবে মূঢ়ের ন্যায় আচরণ করেছিলেন।

কিন্তু পরম কারুণিক সর্ব্বলোকের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অপার কৃপাতেই তাঁরা আবার স্বদোষমুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা অপ্রকট করার পূর্বেই নিজে নিজে ঈশ্বরাভিমানী দেবগণ পুনরায় যাতে আর ভগবন্মায়া দ্বারা মুগ্ধ না হন্ তজ্জন্য নানাভাবে স্তব করেছেন।

এতদ্ব্যতীত সাংসারিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারী। সংসারীর ন্যায় লৌকিক পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ এবং পারলৌকিক যজ্ঞাদি সম্পাদন করেছেন বলে, সাধারণ জীবগণ যাতে তাঁকে সাধারণ লোক জ্ঞান করে অপরাধী না হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ পরিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত, পূজা ও স্তুতি দ্বারা তাঁকে পরমেশ্বররূপে স্বীকৃতি দান করেন ও পরিচিত করেন।

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
বিরিঞ্চি - বৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ॥

—ভাঃ ১।১১।৬

দ্বারকাবাসী প্রজাগণ তাই শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন—হে নাথ, আপনার পাদ-পঙ্কজের বন্দনা করি। স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণও আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করে থাকেন। এ সংসারে যারা শ্রেয়ঃ কামনা করে, ঐ পাদপদ্মই তাদের পরম অবলম্বন। কাল ব্রহ্মাদির প্রভু হ'লেও—আপনার পাদপদ্মের ওপর প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

—ভাঃ ১। ১।৩৮

প্রকৃতিস্থ হয়েও তার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়—তখন তা, মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে যুক্ত হয় না।

'ভগবান স্বয়ং গুণ সমূহে অবস্থান করেন গুণাগুণও তাঁতে অবস্থান করে, তা হ'লে গুণের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত নহেন। বস্তুতঃ

ভগবানেরই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত্বে এবং অধিষ্ঠাতৃত্বে নিগুর্ণত্বই উক্ত হয়েছে।

"সাক্ষী চেতাঃ কেবলা নিগুর্ণশ্চেতি॥"

—গোঃ তাঃ

অর্থাৎ—তিনি সাক্ষী, চৈতন্য কেবল, অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং নিগুর্ণ।

আমি আগেই বলেছি ভগবানের মধ্যে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়। তিনি যেমন নিগুর্ণ, তিনি আবার সগুণ অর্থাৎ তিনিই সব। তিনি সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বময়।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যেস্থিত আত্মনি॥

—ভাঃ ১।৭।২৩

শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী। তুমি স্বরূপ-শক্তি প্রভাবে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে রেখে, স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর।

শ্রীভগবানও বলেছেন :

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং স্রক্ষেহন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মামায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মনা॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণান্বয়ঃ॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৩০-৩১

অর্থাৎ আমি স্বকীয় মায়াশক্তির বলে নিজের মধ্যেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজেতেই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সাধন করছি। আত্মা জ্ঞানময় এবং গুণাতীত বিধায় বস্তুতঃ গুণসমূহে অননুগত ও শুদ্ধস্বরূপ।

দেবতাগণও শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিতে বলেছেন—সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে আপনার লিপ্ত না হবার কারণ এই যে,—আপনি আপনার নিজের অনাবিল আনন্দেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বরং আপনার

কৃপা-প্রদত্ত আনন্দের অংশ লাভ করেই জীব অপার আনন্দ লাভ করে।

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ
এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'

—তৈত্তিরীয় ২।৭

সেই পরমতত্ত্বই রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়ে জীব আনন্দ লাভ করে থাকে। যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ স্বরূপ না হ'তো—কেই বা শরীর ও প্রাণরক্ষার চেষ্টা প্রদর্শন করত। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিরাকরঃ॥

—শ্রীধর

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট, কিন্তু জীব অবিদ্যা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকার।

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ"।

—চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ

মায়া যাঁর বশীভূত তিনিই ঈশ্বর, মায়াদ্বারা যিনি প্রপীড়িত সেই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নিজমধ্যেই আত্যন্তিক দুঃখের অবস্থান।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ নিজ ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের স্তোত্রে বলেছেন—

—হে অন্তর্যামিন। মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐগুলো প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপায় স্বরূপ হয়ে থাকে এবং দম্ভের ফল নিয়ত এক প্রকার হয় না বলে—দাম্ভিক ব্যক্তিদের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা হয় না।

অতএব হে প্রভো! আপনার অলৌকিক যশোরাশি-শ্রবণেই চিত্তের প্রকৃত শুদ্ধি ঘটে, অন্য উপায়ে তা সম্ভব নয়।

শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোক প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা শুভ ফল লাভ না করে, পরিশেষে হরিকথা কীর্ত্তনকারী পরম ভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুর কাছে সমবেত হয়ে বলেছিলেন—

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্য কর্ম্মনঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃনুয়াদযশঃ কলিমলাপহম্॥

—ভাঃ ১।১।১৬

সেই পবিত্র চরিত্র দেবগণ-পূজ্য উরুক্রম ভগবানের কলিকলুষ-হারিণী কীর্ত্তিকথা শুদ্ধিকামী অর্থাৎ আত্মশোধনকারী কারই বা শ্রবণ করা উচিত নয়? অর্থাৎ সকলেরই শ্রবণ করা বিধেয়।

ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃ স্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

—ভাঃ ১।২।১৭

যাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম পাবন; এরূপ সাধুগণের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা ও নামগুণ শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্যগুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

প্রায়োপবেশন-ব্রতধারী মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগদগুরু শ্রীশুকদেবের নিকট ভাগবত শুনতে শুনতে বারবার ভাগবত-কথা শুনতে চেয়ে বললেন—হে মহাভাগ! যে প্রকারে আমি যাবতীয় বিষয়মল থেকে নির্ম্মুক্ত নিঃসঙ্গ মনকে অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবেশিত করে আমার দেহত্যাগ করতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাকে বলুন। কারণ, আমি বুঝতে পারছি যে, যিনি শ্রীহরির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন—ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে এসে উদিত হন্।

সাতানব্বই

শ্রীহরি কর্ণরন্ধ্র দ্বারা (ভক্তজনের স্বীয়কৃত দাস্য সখ্যাদি ভাবদেহে) কথারূপে প্রবিষ্ট হয়ে কামক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ কিছুমাত্র অবশেষ না রেখে বিদূরিত করেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামীর বাক্যেও একথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়,—

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥

—ভাঃ ৬।৩।৩২

যাঁরা শ্রীহরির উদ্দাম পরাক্রম—গাথা নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন,—ভক্তি সুপ্রকাশিত হয়ে তাঁদের অন্তঃকরণকে যেরূপ বিশুদ্ধ করে—ব্রতাদিতে তা সম্ভব হয় না।

ভগবান শ্রীহরি হৃদয়স্থ হ'লে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণীহিতাকাঙ্ক্ষী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপ দ্বারা সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

ভগবান স্থিতিকালে দেহীগণের মঙ্গলসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, অর্থাৎ—মায়াতীত চিন্ময় বপু প্রকটন করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোকসকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধিযোগে ভগবানের পূজা করে থাকেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রকট বপুকে লক্ষ্য করে দেবগণ বলেছিলেন—হে সত্ত্বাত্মা! অর্থাৎ—শুদ্ধ-সত্ত্ব-বপু বিশিষ্ট প্রভো, আপনি অবতারগণের মধ্যে ঋষ্য। কারণ পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা কীর্ত্তন করা হয়েছে—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেউ কেউ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশ বিভূতির অবতার। ঐ সকল অবতারগণ প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্যভার-প্রপীড়িত হয়, তখনই আবির্ভূত হয়ে দৈত্য-প্রপীড়িত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে আপনি স্বয়ং ভগবান্।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ —ভাঃ ১।৩।২৮

উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বললেন—

সব অবতারের করি, সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস॥

—চৈঃ চঃ আ ২।৬৮-৭০

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ব্রজগোপিণীগণের প্রেম-মাধুর্য্যে অভিভূত হয়ে বললেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যা মাহভজন্ দুর্জ্জয়গেহ শৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

—ভাঃ ১০।৩২।২২

আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ তা' বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ত্যাগ করে অনন্যভাবেই আমাকে ভজনা করেছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হ'লে—তোমাদের প্রেমের প্রত্যুপকার সাধনে সমর্থ হ'বো না, অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

কৃষ্ণলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী তথা ব্রজগোপীগণের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছিলেন, সেই ঋণ শোধ করার নিমিত্ত রাধাভাব ও কান্তি গ্রহণ করে গৌররূপে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জানিনা গৌররূপে আবির্ভূত হয়ে সে ঋণ শোধ করতে পেরেছেন কিনা। একমাত্র তিনিই জানেন। আর জানেন গোপীগণ। এ রহস্য উদ্ধার করা সাধারণের সাধ্যাতীত।

—————

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী রাসবিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের প্রণামে বলেছেন—

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প-কন্দর্প-দর্পহা।
জয়তি শ্রীপতি গোপীরাসমণ্ডল মণ্ডনঃ॥

ব্রহ্মাদিদেব-বিজয়ী অতি গর্ব্বিত কন্দর্পের দর্পহারী গোপী-রাস-মণ্ডল-শোভিত রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হো'ন।

যদ্ বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি,
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।
ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রি পদ্ম—
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্॥

—ভাঃ ১০।৮২।২৯

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্রাদি শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের প্রশংসা করে বললেন—যাঁর শ্রুতিগণ প্রশংসিত বিমল কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালন বারি গঙ্গা ও বাক্যস্বরূপ বেদশাস্ত্র—এই বিশ্বকে অতিশয় পবিত্র করছেন এবং এই পৃথিবী কালপ্রভাবে বিনষ্ট-মাহাত্ম্য হয়েও যাঁর পাদপদ্মস্পর্শে পুনরায় শক্তিমতী হয়ে—আমাদের যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ করছেন। সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আপনাদের গৃহে অধিষ্ঠান করায়—আপনারা প্রকৃতই সার্থক জন্মা।

কৃষ্ণ কথামৃতের তুলনা নেই। কারণ কৃষ্ণ কথামৃতের কাছে সমুদ্রোত্থিত স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃতও অত্যন্ত তুচ্ছ।

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্নশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযুষমন্তত্র কুপিতাদ্বিজাৎ॥

—ভাঃ ২।৮।২৬

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন রত মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, অনশন বা কুপিত দ্বিজের

অভিশাপের কথা ভেবেও আমার হৃদয় চিত্ত ব্যাকুল হবে না। কারণ, আমি আপনার বাক্যরূপ-সমুদ্রোত্থিত অচ্যুত-কথামৃত পান করতে থাকব।

সকল তীর্থ মজ্জনান্তে শ্রীউদ্ধবের সহিত মিলিত হয়ে বিদূরও বললেন—হে সখে! শরণাগত নৃপতিবর্গের ও স্বীয় অনুশাসনে অবস্থিত অন্যান্য ভক্তজনের প্রয়োজনে শ্রীভগবান্ অজ হয়েও যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই সংসার-তারিণী কীর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবার্ত্তা কীর্ত্তন করুন।

যিনি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা। কৃষ্ণবিরহ ব্যাকুলা গোপীগণের উক্তিতেই একথার স্বীকৃতি রয়েছে—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

—ভাঃ ১০।৩১।৯

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—তোমার কথামৃত তোমার বিরহকাতর জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণ তোমার কীর্ত্তিকথা স্তব করেন। তোমার কথা প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পদ প্রদায়ক এবং কীর্ত্তন কারিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত। অতএব যে ব্যক্তি তোমার কথামৃত কীর্ত্তন করেন—তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

বিবেকীগণ যাঁর চরিত্রলীলা কথামৃতের কণামাত্র কর্ণপুটে আস্বাদন করে রাগাদি দ্বন্দ্বরহিত ও ভোগে নিস্পৃহ হয়ে দুঃখপূর্ণ গৃহপরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণধারণ নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন—তাদৃশ কৃষ্ণের কথা আমরা ত্যাগ করতে পারছি না।

—শ্রীরাধা (ভাঃ ১০।৪৭।১৮)

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্ন ধর্ম্মম্।

স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন কামদেবম্ ॥

—ভাঃ ১০।৯০।৪৮

পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—জনগণের অন্তর্য্যামীরূপে যাঁর নিবাস অথবা গোপ-যাদবাদি মধ্যে যাঁর নিবাস কিম্বা যিনি জনগণের (জীবগণের) পরম নিবাস বা আশ্রয়, দেবকীর উদরে জন্ম যাঁর পক্ষে বাদমাত্র, প্রকৃতপক্ষে যিনি অজন্মা, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁর সেবক অথবা যিনি যদুগণের সভাপতি, ইচ্ছামাত্রে নিরসনসমর্থ হয়েও যিনি স্বীয় বাহুবলে অথবা সতুল্য অর্জ্জুনাদি ভক্তগণদ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ অসুর-সঙ্ঘের বিনাশকারী, যিনি স্থাবর-জঙ্গমগণের সংসার-দুঃখহারী অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ নিজ সেবকগণের তদীয় বিরহজনিত দুঃখনাশকারী এবং সুস্মিত দ্বারা ব্রজপুরবনিতাগণের অথবা মথুরা, দ্বারকা, ব্রজপুরস্থা বনিতাগণের কামবর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হো'ন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপরোক্ত শ্লোকে ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাধাম এবং তৎ-লীলার নিত্যত্ব কথিত হয়েছে।

শয্যাসনাটনালাপ—ক্রীড়া স্নানাদি কর্ম্মসু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানাং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥

—ভাঃ ১০।৯০।৪৬

শ্রীকৃষ্ণগত চিত্ত সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান প্রভৃতি কর্ম্মে রত থেকেও আত্মবিস্মৃত হ'তেন না।

স্বেচ্ছাময় ভগবানের প্রকটলীলার পুনঃ অপ্রকটনের যখন ইচ্ছা হ'লো, সর্ব্বভূতান্তর্যামীর সেই ইচ্ছা ব্রহ্মার হৃদয়েও সঞ্চারিত হ'লো। স্বীয় নাভিপদ্মজ ব্রহ্মার প্রার্থনায় ও ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য প্রকট হয়েছিলেন, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান ব্রহ্মারই প্রার্থনায় পুনঃ অপ্রকাশিত হবে বলেই ব্রহ্মা আত্মজ, দেবাদিগণ ও শিবসহ দ্বারকায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ সকাশে এলেন।

মরুদ্‌গণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ঋভুগণ, অঙ্গিরাসমূহ, রুদ্রগণ, সাধ্য, বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী হয়ে দ্বারকায় এলেন। ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহের দ্বারা নরলোকের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক সমগ্র জগতে অখিল লোকের পাপবিধ্বংসী যশঃ বিস্তার করেন—সেই অপূর্ব্ব পরম রমণীয় বিগ্রহ দর্শনের নিমিত্ত তাঁরা সকলেই দ্বারকায় উপনীত হ'লেন।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের দেহ অভিন্ন—

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বা-
দ্ভবো ন সক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্তয়ি নোঽবিবেকঃ॥

—ভাঃ ১০।৪৮।২২

ভক্ত অক্রুর শ্রীভগবানকে বললেন—আপনার দেহাদি উপাধি নিরূপিত নয়, এই কারণে আপনার জন্ম তথা দেহ-দেহীর ভেদ বিদ্যমান থাকতে পারে না। অধিকন্তু, আপনার অবিদ্যা নাই অতএব তন্নিবন্ধন বন্ধ ও মোক্ষ হ'তে পারে না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—অবিদ্যার-বিদ্যমানতা না থাকলে অবিদ্যাসম্বন্ধীয় দেহ কিরূপে সম্ভব?

তদুত্তরে এই কথা বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহাদি ও উপাধি যে অবিদ্যাহেতু—ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞ কর্তৃক নিরূপিত হয়নি। অতএব মায়াবদ্ধ জীবের মতো ভগবানের সংসার বা জন্মলাভ হয় না। যদি ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় অবিদ্যাজনিত দেহযুক্ত হ'তেন—তবে তিনি স্বতন্ত্র হ'লেও জীবেরই ন্যায় জন্মাদিমান হ'তো, কিন্তু ভগবানের দেহাদির উপাধিত্ব—অভাবহেতু জীবের মতো তাঁর সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হয়ে থাকে। অতএব জীবের ন্যায় দেহ থেকে পৃথক ভগবানের আত্মা নয়।

ভগবানের দেহ ও ভগবানে কোন প্রভেদ নেই—অর্থাৎ ভগবানে দেহ-দেহীর পার্থক্য নাই। অতএব ভগবানের যেমন বন্ধনও নাই, তেমন মুক্তিও নাই। (শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকানুযায়ী উপরোক্ত মন্তব্য)

শরীরী ভগবান ও তাঁর শরীর একই পদার্থ।

শ্রীভগবান আত্মবিগ্রহ। অর্থাৎ সেই বিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই দেহ বিগ্রহ ঃ—

'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়'—

ঐ আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই তাঁর বিগ্রহ।

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত সমান॥
নাম', 'বিগ্রহ', স্বরূপ,—তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ স্বরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম-নাম দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'॥

—চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যলীলা ১৭ পঃ

আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারেন,—ভগবান ও তাঁর শরীর যদি অভেদ, এবং ভগবান যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হন্—তবে নরলোকে তাঁর সেই বিগ্রহ দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়?

তাঁর মীমাংসা এই যে,—জগতের হিতের জন্য নিহেতুক অচিন্ত্য দয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই জগতে জগজ্জনের নিকট দেহধারীর ন্যায় প্রতীত হন; স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিধায় ঐরূপ প্রকাশিত হন মাত্র। তাঁর অর্তক্য ইচ্ছায় তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হন্—কিন্তু তৎকর্ত্তৃক অগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ তাকে স্বয়ংই শব্দাদির ন্যায় গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না।

ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের যে দর্শন লাভ হয়, তা কেবল তাঁর অর্তক্য অচিন্ত্য কৃপাশক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক। তিনি পরম

করুণাভরে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজদর্শন সামর্থ্য প্রদান করেন, কেবলমাত্র সেই সেই ভাগ্যবান তাঁর দর্শন লাভে সক্ষম।

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বিবা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥

—মহাভারত শাঃ পঃ ৩৩৮।২০

হে বৃহস্পতি, তুমি অথবা আমরা তাঁকে দর্শন করতে সমর্থ নই। তিনি যাকে কৃপা করেন, একমাত্র তিনিই তাঁকে দেখতে পান্।

ভক্তপ্রবর শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন—

অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যাবে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় হয়েও স্বীয় শক্তি প্রভাবে ভক্তজনকে স্বদর্শনদানে সক্ষম।

তাঁরই অসীম কৃপায় ও ইচ্ছায় ভক্ত ও অভক্তগণ সকলেই দর্শন লাভ করলেও—উভয়ের দর্শন ও দর্শন ফল এক হয় না। কারণ ভক্তজনকে ভগবান স্বীয় কৃপাদৃষ্টিদানে স্বীয় পরম মাধুর্য্যের অনুভব সহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে অসুরগণের মাধুর্য্যানুভবরহিত ভগবদ্দর্শন সুখকর হয় না। দর্শনের এই প্রকারভেদে সমদর্শী ভগবানের বৈষম্য দোষ নেই—জীবের চিত্তবৃত্তিই এর জন্য দায়ী।

দেবগণ দ্বারকায় গমন করে অতি সুন্দর দর্শন কৃষ্ণকে অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ বার বার ঐ সচ্চিদানন্দস্বরূপকে দেখেও তাঁরা তৃপ্ত হ'তে পারেননি। যে রূপের পরিবর্ত্তন হয়—

সেরূপ দেখে অতৃপ্ত হওয়াইতো স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রূপ—চিরনূতন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে নাথ, আমরা আপনাকে 'বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবাচোভিঃ' প্রণাম করছি। অর্থাৎ আমরা জগৎকার্য্যে ঈশ্বর বলে প্রতীত হ'লেও——প্রকৃতপক্ষে আপনিই একমাত্র প্রভু বা স্বামী। আপনিই মূলকর্ত্তা। আমরা আপনার শক্তিতেই শক্তিমান্ হয়ে আপনার ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী। আপনি ব্যতীত আমাদের ব্যক্তিগত কোন অস্তিত্ব বা সামর্থ্য নেই এবং আমরা অনাথ।

আমাদের যে কোন অংশে কর্ত্তৃত্বের অভিমান হয়, আমরা সেই সেই অংশ আপনাতে অর্পণ করে আপনার সেবায় ব্রতী হ'তে চাই।

আমরা যে বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে সদসৎ বিচার করি, যে চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, যে পদদ্বয় দ্বারা যাতায়াত করি, যে বাহুদ্বারা কার্য্যসাধন করি, যে প্রাণশক্তির দ্বারা দেহ সঞ্চালন করি, যে মনের দ্বারা সঙ্কল্প—বিকল্প করি এবং যে বাক্যের দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করি—এ সমুদয় আপনারই প্রদত্ত আমাদের ব্যবহারোপযোগী উপকরণ মাত্র। আপনি অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। আপনার প্রদত্ত সামগ্রীই আপনার সেবায় প্রদান করলুম। আপনি কৃপাপরবশ হয়ে গ্রহণ করুন।

ভাবযুক্ত মুমুক্ষুগণ কেবল ভগবানের চরণ অন্তরে চিন্তা করেন, কিন্তু দর্শন করতে পারেন না। ভাবরহিত শুষ্ক মুমুক্ষুগণ ভগবানের চরণ চিন্তনেরও অযোগ্য। দেবতাগণ শ্রীভগবানের পরম কৃপাতেই তাঁর রূপগুণাদির সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধন্য হ'লেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য!

তবাবতারোঽয় মধোক্ষদেহ,
ভুবোভাবানামুরুভার জন্মনাম্।

চমূপতীনাম ভবায় দেব,
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥

—ভাঃ ১০।২৭।৯

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন,—হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভার জনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্য-সৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের (ভক্তজনের) মঙ্গলবিধানের জন্যেই এই মর্ত্ত্যধামে আপনি কৃষ্ণরূপে আগমন করেছেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আরও বললেন—প্রভো, আপনার চরণারবিন্দ যে ভক্ত কলুষ হরণে প্রধান উদ্যোগী, তা আপনার ত্রিবিক্রম বা বামনাবতারে ত্রিবিধভাবে বিশেষরূপে মহাবিভূতিযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বলিরাজার বন্ধনে আপনার যে ত্রিপাদ বিক্ষেপে তিনলোক ব্যাপ্ত হয়েছিল—আপনার যে শ্রীচরণ থেকে উদ্ভূত সলিল ত্রিধারায় ত্রিভুবনে প্রবাহিত হয়ে সংসার-তরণের পতাকারূপে বিদ্যমান হয়েছে, আপনার সেই চরণ আমাদের চিত্তের পাপ শোধন করুক।

এ সম্পর্কে পরম ভাগবত শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন—হে রাজন্! ভগবান ত্রিবিক্রম (বামনাবতার) তৎকালে সমুজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রীবৎস কৌস্তুভ, মেখলা, এবং ভ্রমর পঙ্ক্তি বিরাজিত বনমালায় বিভূষিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিলেন। তিনি এক পদবিন্যাসে বলির যাবতীয় ভূমি-ভাগ, শরীর দ্বারা আকাশ-প্রদেশ, ভুজ সকলদ্বারা দিক্‌সমূহ আক্রমণ করলেন। পরে দ্বিতীয় পদদ্বারা স্বর্গ আক্রমণ করলে—তৃতীয় পদ বিন্যাসের জন্য বলির অনুমাত্র স্থানও রইল না আর। ত্রিবিক্রম শ্রীহরির চরণ স্বর্গ ছাড়িয়ে ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করতে করতে মহঃ, জন এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিল।

তদনন্তর বলির উৎকর্ষ স্থাপন মানসে—তৃতীয় পদ পূরণচ্ছলে ভগবান বলিকে বন্ধন করলেন। বলির সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায়

দৈত্যগণ বলির নিষেধ সত্ত্বেও ভগবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, কিন্তু তদীয় পার্ষদগণের দ্বারা পরাজিত হয়ে বলির আদেশে পাতালে আশ্রয় নিল।

সর্বস্বান্তঃ, বরণপাশে আবদ্ধ ভক্ত বলি তখন ভগবানকে বললেন—

যদ্যুত্তমঃ শ্লোক ভবান্মমেরিতং
বচো ব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং
পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্॥

হে উত্তমশ্লোক! হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতি বাক্য মিথ্যা মনে করেন, তা'হলে আমি তার সত্যতা সম্পাদন করছি—আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হ'বে না। আপনি আমার মস্তকেই তৃতীয়পদ বিন্যাস করুন।

গঙ্গার ত্রিধারা সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজন পবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্য ভূন্নভসি সা পততীনিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্ত্তিঃ।

—ভাঃ ৮।২১।৪

ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল উরুক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অতীব পবিত্র হওয়ায় স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হয়েছিলেন। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিত হয়ে শ্রীহরির বিমল কীর্ত্তির ন্যায় ত্রিলোককে পবিত্র করছে।

(১) ব্রহ্মার কমণ্ডুল জল বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে পবিত্র হয়ে গঙ্গা হয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে পরমভাগবত শ্রীশুকদেব মহারাজা পরীক্ষিৎকে বলেছেন—ত্রিবিক্রম ভগবানের দ্বিতীয় চরণ যখন সত্যলোকে প্রবিষ্ট হলো, তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের নিকটে আগমন

করলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এবং সত্যলোকবাসিগণ সকলেই তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। অতঃপর ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত সেই পাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করলেন এবং ভক্তিভরে পূজা ও স্তব করতে লাগলেন।

(২) ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধের সুমেরুর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, বামনদেবের বামপদের অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ডকটাহের উর্দ্ধভাগে নির্ভিন্ন বহির্জলধারাই গঙ্গা।

পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন—হে রাজন্, যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু বলির যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করে যখন পাদক্ষেপ করেন—সেইক্ষণে দক্ষিণ চরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করে ভগবান বিষ্ণু যখন উর্দ্ধদিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করেছিলেন—তখন তাঁর বামপদের অঙ্গুষ্ঠ নখের অণ্ডকটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হয়ে যায়। এবং ঐ রূপ নির্ভিন্ন হওয়ায় ফলে এক গর্ত্তের সৃষ্টি হয়—ঐ গর্ত্তের মাধ্যমে পৃথিব্যাদি অষ্টাবরণের বহির্ভূতা কারণার্ণব সম্বন্ধিনী এক চিন্ময়ী জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়।

সেই জলধারায় প্রক্ষালন হেতু ভগবানের পাদপদ্ম থেকে যে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হয়, তা কিঞ্জল্ক-স্বরূপে উক্ত জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারার স্পর্শমাত্রেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি প্রক্ষালন হয়। কিন্তু ঐ পবিত্র জলধারা অত্যন্ত নির্ম্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে ঐ ধারা সাক্ষাৎ ভগবানের পাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হওয়ায়—বিষ্ণুপদী নামে কীর্ত্তিতা হ'তেন।

জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি কোন ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না তাঁর। সহস্রযুগ পরিমিত সুদীর্ঘকাল পরে ঐ ধারা ধ্রুবলোকে সঞ্চারিত হয়। পণ্ডিতগণ সেইজন্য ধ্রুবলোককেই বিষ্ণুপদ' আখ্যা দিয়ে থাকেন।

(৩) সাক্ষাৎ নারায়ণই দ্রবরূপে গঙ্গা।

যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ
স এব দ্রবরূপেন গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ ।। সন্দর্ভ-৬৮ সংখ্যা

'উপরোক্ত তিন ধারার সঙ্গমেই গঙ্গা'

—শ্রীবিশ্বনাথ

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পূর্ব্বে দেবগণকে বললেন—, সমুদ্রের উদ্বেলিত জলরাশি যেরূপ সুদৃঢ় বেলাভূমি কর্ত্তৃক রক্ষিত ভূ-ভাগকেও জল প্লাবনের দ্বারা বেলাভূমির মর্য্যাদা নষ্ট করে লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, সেইরূপ এই যদুকুল আমাকে স্বজন বলে অহঙ্কৃত হয়ে আমা দ্বারা সুরক্ষিত ভূ-লোককে ধ্বংস করে আমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারে।

যদিও আমার পরিজন এই পরমধার্ম্মিক যদুগণের ভারে পৃথিবীর ভারবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক—তথাপি পৃথিবীস্বামী আমার পক্ষে এই ভার অবতারণ করা সঙ্গত।

সুকুমারী বনিতার অতি বহুতর ভূষণভার যেমন তাঁর কান্ত অবতারণ করেন—সেইরূপ। যদিও অভিলষিত বস্তুর ভার সহ্য করতে কষ্ট হয় না, কিন্তু তা' অতি ভার হ'লে সহ্য করা সহজ সাধ্য হয় না—যেমন অকস্মাৎ প্রাপ্ত হলেও অনেক ওজনের সুবর্ণরাশির ভার লোভী বণিকের পক্ষেও দুর্ব্বহ।

ব্যক্তিগত সংখ্যাদ্বারা পৃথিবীর ভারবোধের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান পর্ব্বত সমুদ্রাদিও ভারযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে অধার্ম্মিকগণের প্রাচুর্য্যই পৃথিবীর ভারবোধের কারণ।

কিন্তু যদুকুল অধার্ম্মিক বাচ্য নয়, কারণ তাঁরা ভগবানেরই পরিকর। তবু শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে ঐ পর্য্যায়ে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ বললেন কেন?

ভার দু'প্রকার—দুঃখরূপ ও সুখরূপ। দুঃখরূপ ভার দুঃসহ, কিন্তু সুখরূপ ভার সুসহ। যেমন জীবন সর্ব্বস্ব পতির ভার, ভারবোধ বিধায়ও পত্নীর নিকট সুসহ, ক্রোড়স্থিত পুত্রের ভার ভারবোধ

হ'লেও জননীগণ আনন্দের সঙ্গেই সহ্য করে থাকেন, মস্তকস্থিত ধনভার ও সুবর্ণরাশির ভার বণিকগণ ভারবোধ বিধায়ও উপেক্ষা করে থাকেন, কিন্তু স্বল্পবলশালী ব্যক্তি নিজের বহনোপযোগী ভার অপেক্ষা কোন কিছু (এমনকি ঈপ্সিত বস্তু) অত্যন্ত গুরুভার যুক্ত হ'লে—সে আর ঐ ভার বহনে সক্ষম হয় না। সুখরূপ ভার তখন তার কাছে দুর্ব্বহ রূপেই প্রতিভাত হয়।

স্বনিগমমহায় মৎপ্রতিজ্ঞা—
ঋতমধিক কর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথ চরণোঽভ্যায়াচ্চলদ্‌গু—
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥

—ভাঃ ১৷৯৷৩৭

কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম—নিকটে দণ্ডায়মান যুধিষ্ঠিরকে বললেনঃ যিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেও আমার প্রতিজ্ঞার সততা রক্ষা ও অধিক করবার নিমিত্ত আকস্মিকভাবে রথ থেকে অবতরণ করে রথচক্র ধারণ করলেন। এবং স্বীয় উত্তরীয় বসনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে—সিংহ যেমন বেগে হস্তীর প্রতি ধায় —ঠিক তদ্রূপ বেগে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে আমার দিকে ধেয়ে এলেন।

উপরোক্ত শ্লোক থেকে একথাই বোধগম্য হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে চরণযুগল ধারণ করে পৃথিবী পরমধন্যা হয়েছিলেন; কিন্তু যখন ভগবান পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বল প্রকট করে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তখন ভগবানের সুখরূপ সুসহ ভারও পৃথিবীর পক্ষে দুর্ব্বহ হয়েছিল।

যদিও যদুকুলের ভার পৃথিবীর পক্ষে সুসহ—তথাপি যেমন সুকুমারী বণিতা বহুবিধ স্বর্ণাভরণাদি ধারণ করে করে অলঙ্কারাদির ভার বোধ করে না, কিন্তু প্রেমময় পতি তাঁর অঙ্গ থেকে উৎসবোপলক্ষে পরিধৃত কোন কোন বহুমূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করে অতি যত্নে রক্ষা করে—কেবলমাত্র সচরাচর ব্যবহারযোগ্য আভরণ উন্মোচন

করে না, তদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপরিকররূপ যাদবাদিতে দেবতাগণের যে যে অংশ সমূহ প্রবিষ্ট হয়েছিল—সেই দেবগণকে দ্বারকা থেকে প্রভাসে এনে উপসংহার করেছিলেন।

বৃন্দাবন ও মথুরার ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম লীলাস্থলী দ্বারকাও দেশ, কাল ও পাত্রাতীত।

এহেন দ্বারকায় কালকৃত মহোৎপাত কিরূপে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে নিজ লীলাপরায়ণ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই ঐরূপ অরিষ্ট দৃষ্ট হয়েছিল।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে স্যমন্তক মণি হরণে প্রয়োজক অক্রুরও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মণিহরণকারী শতধন্বার নিধন সংবাদ পেয়ে এত ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি দ্বারকা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অক্রুর কাশীতে উপস্থিত হয়ে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ-গণকে যথেষ্ট ধনদান করছিলেন, এরূপ সংবাদ পেয়ে দ্বারকাবাসীরা ভেবেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাক্রমেই অক্রুরকে কাশীতে অবস্থান ও স্যমন্তক মণি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বারকাবাসীগণের এরূপ জল্পনা-কল্পনা সত্যভামা ও বলরামাদির অবিশ্বাস হ'লে—ভগবান স্বয়ং স্বীয় কলঙ্ক বিমোচনের জন্য দ্বারকায় নানাবিধ অনিষ্টের উৎপত্তি করেছিলেন, যাতে দ্বারকাবাসিগণ নিজেরাই অক্রুরকে আনয়নে যত্নবান হন্।

শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনিষ্টের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে দ্বারকাবাসীগণ ভাবলেন—স্যমন্তক মণি সহ অক্রুরের অনুপস্থিতিই এই অনিষ্ট উৎপত্তির কারণ।

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্।
মুনিবাস নিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্॥

তাই শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন,—হে রাজন, তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি প্রাগুদাহৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিস্মৃত হয়ে—

অক্রুরের অনুপস্থিতিকেই (অথবা অক্রুরের প্রবাসে অবস্থান কারণেই) অমঙ্গলের কারণ বলে স্থির করল, কিন্তু যেখানে একজনও মুনির নিবাস থাকে তৎপ্রভাবে সেই গ্রামে বা নিবাসে কোনরূপ অনিষ্ট বা উৎপাত ঘটেনা—আর যে দ্বারকায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান এবং তদ্দর্শনার্থী সকল মুনিগণের অবস্থান (অথবা সকল মুনির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের যেখানে অবস্থিতি)—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত অক্রুরের অনুপস্থিতির কারণে কখনও অমঙ্গল ঘটতে পারে কি ? অর্থাৎ পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলেই যাদবগণকে অনায়াসে ব্রহ্মশাপ মুক্ত করতে পারতেন, কারণ শ্রীভগবদ্দর্শনেই ব্রহ্মশাপ মুক্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মান মেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহিতে॥

—ভাঃ ১০।৩৪

সুদর্শন নামক বিদ্যাধর অঙ্গিরা ঋষির অভিশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন্। শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সর্পদেহ ত্যাগ করে স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হয়ে তিনি বললেন,—হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করেই সদ্য ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। লোকে যাঁর নামমাত্র উচ্চারণ করেই নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজেকে পবিত্র করে—সেই আপনার পাদ-স্পর্শে আমি পবিত্র হয়েছি, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?

অতএব যে যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিরাজিত—সেখানে কোন ব্রহ্মশাপেরই প্রভাব কার্যকরী হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পূর্ণ অবতারের সকল উদ্দেশ্য সাধন করার পরই ঐরূপ অভিনয় করেছিলেন।

নিত্যলীলা পরিকর উদ্ধবও এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন,—হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং যেখানে বিরাজিত, সেখানে ব্রহ্মশাপের প্রভাব থাকতে পারে না। আপনার ইচ্ছাতেই ঐ শাপ

একশ' তের

প্রযুক্ত হয়েছে—এবং আপনি শাপ নিবারণে সমর্থ হয়েও—ঐ শাপ নিবারণ তো করলেনই না, বরং সকলকে দ্বারকা থেকে প্রভাসে যাওয়ার আদেশ করলেন।

হে প্রভো, আপনার দর্শন থেকেও কি প্রভাস স্নানের মহিমা অধিক? না, তা কখনই হ'তে পারে না। অতএব ব্রহ্মশাপ নিবারণ না করার এবং যাদবগণকে প্রভাসে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় থেকেই আমার মনে হয়—আপনি এই ছলেই অন্তর্হিত বা অপ্রকট হবেন।

এ সম্পর্কে শ্রীশুক বচনও বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য।

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছবি প্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত॥

—ভাঃ ১১।৬।২৪

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিষয় অবগত হয়েই ব্রহ্মশাপ অন্যথা করতে ইচ্ছা করলেন না; বরং কালরূপী হয়ে তিনি ব্রহ্মশাপকেই অনুমোদন করলেন।

নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্য সুখানুভূঃ॥

—পাদ্মে

জগৎপতি ভগবান নিত্যাবতার বা নিত্যলীলা বিশিষ্ট নিত্যমূর্ত্তি, নিত্যরূপ, নিত্যগন্ধ এবং নিত্য-ঐশ্বর্য-সুখানুভূতিবিশিষ্ট।

প্রকটে বা অপ্রকটে সর্ব্বদাই তিনি বিরাজমান। দেখার মতো চোখ থাকলেই তাঁকে দেখা যায়, ভাবের মতো মহাভাব থাকলেই নিত্যই তাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি অনুভব করা যায়।

তাই নিত্যলীলা পরায়ণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ বা মথুরার মতো তাঁর লীলাস্থলী দ্বারকাও প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ করেননি, প্রভাসে যাদবগণের মধ্যে পারস্পরিক যে সংগ্রাম তা'ও মায়িক। এবং মায়িক হ'লেও তা' তাঁর নিত্যলীলারই অঙ্গীভূত। এবং মৌষল লীলার তাৎপর্য্যও সেখানেই। শ্রীকৃষ্ণভগবানের স্বীয় উক্তিতেই

এরূপ লীলার স্বীকৃতি। ভাগবতের ১১।৩০।৫ শ্লোকটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

স্বভক্ত উদ্ধবকে শক্তি-সঞ্চার করে বদরিকা আশ্রমে প্রেরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন—"আমার কুরুক্ষেত্র যাত্রাকালে যখন নানা দিক্ ও দেশসমূহ হ'তে বিভিন্ন লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তখন কলিও সকলের অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'প্রভু, ভুবনে আমার অধিকার কবে বর্ত্তাবে?' কলির জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বলেছিলাম—আমার লীলা সমাপ্তিতেই তোমার অধিকার সুরু হ'বে।'

"অতএব আমার অন্তর্দ্ধানের পরেই আমি কলিকে পৃথিবী অধিকার করতে অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু আমার অবতারকালে সম্প্রতি ধর্ম্ম কৃতযুগ অপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভে পূর্ণ চারিপাদেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ধর্ম্মের এরূপ প্রাবল্য বিদ্যমান থাকলে কলির পক্ষে ভুবনের অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। যখন ধর্ম্ম কেবল একপাদ মাত্র থাকবে—তখনই কলির পক্ষে অধিকার লাভ করা সম্ভব।

'নিমিত্তের খণ্ডনে নৈমিত্তিকের খণ্ডন হবে'—এই ন্যায়ানুসারে আমি অপ্রকটে গেলেও—ধর্ম্মের প্রাবল্য হ্রাস এরূপ স্থির করা সঙ্গত নয়। আমার অনুকূল, প্রতিকূল ও তটস্থ লোক সমূহের মধ্যে—আমি প্রতিকূল-লোকদের প্রায় সংহার করেছি। যাঁরা বিদ্যমান রয়েছে, তাঁরাও তেমন বিক্রমশালী নয়। এই অবস্থায় রামাবতারের ন্যায় আমি যদি সর্ব্বলোক সমক্ষেই আমার ধামবাসীগণ সহ বৈকুণ্ঠে গমন করি, আমার অনুকূল ভক্তগণের প্রাবল্য মোটেই হ্রাস পাবে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করবে। অত্যন্ত অনুকূল পরমোৎকণ্ঠাবস্ত এবং শতগুণিত প্রেমিকে রূপান্তরিত হবেন। তটস্থ লোকগণ পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে—ভক্তে রূপান্তরিত হবেন। এরূপে ধর্ম্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে—কলির প্রবেশের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হবে।

'অতএব মৎদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কলির অধিকারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। এবং ধর্ম্ম সঙ্কোচার্থ—অধর্ম্ম মতকে উত্থাপন করতে হবে।

আমি লীলা পরিকরগণ সহ ব্রজ, মথুরা এবং দ্বারাবতীতে যেমন বিরাজ করছিলাম—তেমন ভাবেই বিরাজ করব। কিন্তু প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে আমি পরিকর সহ অন্তর্দ্ধান করেছি—এইরূপই বোধগম্য হবে।

এবং প্রদ্যুম্ন শাম্বাদি আমার নিত্য পরিকরগণের মধ্যে তত্তৎ বিভূতি স্বরূপ কন্দর্প, কার্ত্তিকেয়াদি যে সকল দেবগণ প্রবেশ পুর্ব্বক অবস্থান করছেন—তাঁদের যোগবলে অলক্ষ্যে সেই সেই দেহ থেকে নিষ্কাশিত করব।

তৎপর সর্ব্বলোকলোচনে প্রদ্যুম্নাদিকে সাধারণভাবে প্রকাশমান রেখে—অন্য দ্বারকাবাসীগণের সঙ্গে প্রভাসে গমন করব।

তথায় দান, ধ্যান ও মধুপানাদি করিয়ে সেই সকল আধিকারিক ভক্তগণকে (অর্থাৎ আমার পরিকররূপে যে সকল দেবগণ ধরাধামে এসেছিলেন) স্ব স্ব অধিকারেই স্বর্গে প্রেরণ করব। এবং অন্য দ্বারকাবাসী জন সহ দাশরথি স্বরূপের ন্যায় আমি বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করব।

কিন্তু আমার এইরূপ কার্য্যকলাপে মায়াদোষ প্রবেশের ফলে লোক-লোচনে অন্যরূপ মনে হবে। তারা মনে করবে—দ্বারাবতী থেকে যাদবগণ প্রভাসে অবস্থান কালে ব্রহ্মশাপের ফলে সুরা-পানাদির দ্বারা মত্ত হয়ে—পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে মৃত্যুবরণ করল। পরমেশ্বরও শ্রীবলরাম সহ মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে স্বধামে ফিরে গেলেন। এইরূপ চিন্তাধারা সঞ্জাত হওয়ার ফলে—লোকে ভাববে যে, আমার এই মনুষ্য শরীর মায়িক ও অনিত্য।

আমার মনুষ্য শরীরে এবং আমাতে কোন প্রভেদ নেই, কিন্তু জীবসকল ঐরূপ জ্ঞানে মহা অপরাধী হবে। আমিই তো বলেছি—'মূঢ় সকল মনুষ্য-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে।'

এইরূপে যারা আমার মনুষ্য দেহকে অবজ্ঞা করবে—তাঁরা যদি

আমার ভক্তও হয়, তাঁদের মৎ প্রাপ্তির আশা নিষ্ফল হবে। যদি তাঁরা কর্ম্মী হন—তবে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে না, যদি তাঁরা জ্ঞানী হন—তবে তাঁদের মোক্ষলাভ সম্ভব হবে না। কারণ তাঁরা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিদ্বারা মুগ্ধ হবেন।

কেউ বলবেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর হয়েও যখন দৃশ্য সাধারণ শরীর ধারণ করেছিলেন—তখন তাঁর সেই শরীর অনিত্যই। তবে দিব্যদেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী আর মনুষ্যদেহ অল্পকাল স্থায়ী। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র ভেদ বিদ্যমান।

অন্যেরা বলবেন—কুরুবংশ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে ধ্বংস হয়েছিল, সেরূপ কৃষ্ণও স্ববংশকে প্রভাসে ধ্বংস করেছেন।

এ প্রকারে অধম বিজ্ঞ মানী দুর্জ্জনগণের কুমত শ্রবণ, জল্পন, অনুমোদন এবং প্রচারাদি দ্বারা ধর্ম্ম সত্ত্বই একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকবে। এবং কলির পক্ষে ভুবনের অধিকার লওয়া সম্ভব হবে।

যেমন পিত্তাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি—ধবল ও উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীত দর্শন করে, তেমন মায়াদোষদূষিত চিত্তদৃষ্টিতে জনগণ সচ্চিদানন্দময়ী আমার নির্য্যাণ লীলাকেও প্রদ্যুম্নাদি পরিকর সহ আমার দেহত্যাগ, এবং রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণের অগ্নিপ্রবেশ লীলাকে—দুরবস্থাময়ী প্রাকৃতিক ভাবে দর্শন করবে এবং বিচার করবে।

কেবল যে প্রাকৃত লোকগণই এরূপ বিচার করবে তা নয়, মদংশজাত অর্জ্জুনাদি, এমনকি বৈশম্পায়ন পরাশরাদি মুনিগণও স্ব স্ব সংহিতায় এরূপ বর্ণনা করবেন। (ভাঃ ১।১৫।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কলির উত্তরোক্ত প্রাবল্য লাভের জন্য মদ্ভক্ত শঙ্করও কলিযুগে জন্মলাভ করে—আমার ঐরূপ অভিপ্রায়যুক্ত বেদান্তভাষ্য প্রচার করবেন। সেই শাস্ত্রাদি বারবার আলোচনা করে হতবুদ্ধি জনগণ ব্যাখ্যা করবে যে—'অনেক শক্তিমান্ সূক্ষ্ম কারণোপাধিমায়াই ভগবদ্দেহ'……।

কলিযুগের অধিকারের এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেই শ্রীকৃষ্ণ স্বপরিকর সহ অপ্রকটে গমন করলেন।

এ সম্পর্কে আমার গুরুদেব শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর চরণকমলদ্বয় স্মরণ করে শুধু একটা কথা বলে যাই, 'কলির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ লীলা অপ্রকটনের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীরাধা তথা গোপী-গণের নিকট তাঁর ঋণের কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলেন, তাই সেই ঋণ শোধ করার জন্যই তাঁকে আবার রাধার ভাব ও কান্তি স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে মর্ত্যে আসতে হলো। কলিকে তাঁর অধিকার লাভ করার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হ'লো তাই।'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবান, শঙ্কর ও অন্যান্য বিরুদ্ধমতবাদিদের মতকে খণ্ডন করে বললেনঃ কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। দেহ ও দেহীতে এক্ষেত্রে কোন প্রভেদ নাই।

[illegible] 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত সমান।
'নাম', 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ॥

কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধেও শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলেছেন—

"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণ-আদি,—সব মায়াময়॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২৩ পঃ

জীবের প্রতি অসীম করুণাময় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলেই কলিকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো।

জীবের প্রতি অসীম করুণা বশেই আমার গুরুদেব শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী কাঁদতে কাঁদতে গেয়ে গেয়ে বললেন—

"আন কথা আর লাগে না ভালো, বলো বলো ভাই কৃষ্ণকথা বলো। তোমাদের হাতে ধরি, পায়ে ধরি, বার বার শুধু কৃষ্ণকথা বলো।"

সাংসারিক বিষয় সমূহের মাধ্যমে কলি আমার মধ্যে তার প্রভাব বিস্তারে সদা সচেষ্ট, কিন্তু বহুদূর থেকে পরম ভাগবত শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর সেই আকুল আবেদন 'আন কথা আর লাগে না

ভালো, বলো বলো ভাই কৃষ্ণ কথা বলো…' মাঝে মাঝে শুনতে পেয়ে আমি বিচলিত হয়ে পড়ছি।

আমি পাপী-তাপী-ভোগী। ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপা ধরে রাখার যোগ্য পাত্র আমি নই, জানি না কত জন্মান্তর পর যাদৃচ্ছিক ইচ্ছা বশে সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করব। তবুও সকল বৈষ্ণবের চরণে আমার নিবেদন—আপনারা পরম করুণাবশে আমাকে গুরু কৃপা ধারণের যোগ্য করে তুলুন।

জানি কলি আসছে, তার প্রভাব সর্ব্বত্রই চোখে পড়ছে—অসীম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা আমরা বিস্মৃত হ'তে চলেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যখনই আমরা পরিপূর্ণভাবে বিস্মৃত হ'বো, কলি তখনি আমাদের গ্রাস করবে। কলি সেই অপেক্ষায় আমাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাই শেষবারের মতো শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বনাম প্রচার লীলার কথা বলে যাই ঃ

'আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—'কৃষ্ণ গাও গিয়া'॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ—ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২৮ অঃ

এমন করে কৃষ্ণকথা বলবার জন্য, অসীম করুণাবশে আর কেউ তো আবেদন জানাবেন না।

আর তো কেউ পরম করুণাবশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বলবেন না—

কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ নাম-গুণ বই বলিও না আর॥

তিন

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক চিন্তাধারা এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম নূতন করে বিশ্বময় আবার ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পক্ষে এ আনন্দের কথা, গর্ব্বের কথা। শ্রীমন্মহাপ্রভূ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সাধারণ মানুষদের হরিনামের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের জন্য তিনি রসরাজ-উপাসনার প্রবর্ত্তন করেছেন। রসরাজ উপাসনা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরূহ বিধায়—তিনি হরিনামের মাধ্যমে সকলকেই পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন।

মানুষ যুগ যুগান্ত ধরে ঈশ্বরের দরবারে কেঁদেছে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের জন্য কাঁদলেন।

'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভূ জীবের লাগিয়া।'

ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব হলেও স্বীকৃত।

শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি নিয়েই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অনুপম রূপ ও অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে।

তাঁর রূপের যেমন তুলনা নেই, মায়াবদ্ধ জীবেদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহও তেমনি তুলনা রহিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলেছেন :—

অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে॥

—চৈতন্যভাগবত অ'৭ অ

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মকে ব্যর্থ আচার-অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা করলেন। দর্শন শাস্ত্রকেও অন্তঃসারশূন্য

তর্ক থেকে মুক্ত করলেন। 'প্রেম' শব্দটি ছিল কেবলমাত্র অভিধানে—সেই চির-অনর্পিত প্রেমধনে চির অভাবগ্রস্ত-ও দৈন্য-যুক্ত মানুষকে ধনী করলেন। এ করুণার তুলনা হয় না।

মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হওয়ার ফলে এবং অপূর্ণ হওয়ায় এতকাল শুধু দেবতার কাছে চাইত—ধন দাও, যশ দাও, সুন্দরী বণিতা দাও।

প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু মানুষকে চিরকালের সেই দীনতা থেকে মুক্ত করে বললেন—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণ-প্রেমেই মহানন্দ। চাওয়ার মধ্যে আনন্দ নেই। ভগবানকে আপনজনের মতো ভালোবাসো। প্রেমভক্তি এক অচিন্ত্যশক্তি। সর্ব্বেশ্বর ভগবান যার বশ।

বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব ও লুপ্ত তীর্থ সমূহকে উদ্ধার করলেন।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা' লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

*　　*　　*

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের ভজন।
নিষিদ্ধ—পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

—চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ

অন্ন খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে,—সেই সে 'ধনবন্ত'॥

—চৈঃ ভাঃ ৯ অঃ

*　　*　　*

সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা, পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর, সেই বড় 'ধনী'।
প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ 'দরিদ্র' জীবন॥

মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধানের জন্য—

একশ' একুশ

অন্যান্য পশুরাও সচেষ্ট। তবে পশুতে আর মানুষে কি তফাৎ রইল? শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বললেন—ভোগের মধ্যে সুখ নেই। ভোগবাদ মনুষ্য নামধারী ব্যক্তিদের পক্ষে অনুপযুক্ত।

ভগবদুপাসনাই বিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি সঞ্জাত হয় তাই প্রকৃত বিদ্যা। এবং সেই বিদ্যাই সকল বিদ্যার মধ্যে সার—

"তাঁহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥ —চৈঃ ভাঃ

* * *

"প্রভু কহে 'কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?'
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ

ভক্তি রহিত কর্ম্ম বা জ্ঞান চিরস্থায়ী সুফল প্রদানে অসমর্থ।

'ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥'
'এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
'কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

ভোগবাদ, কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদকে খণ্ডন করেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—ভক্তি এক অচিন্ত্যশক্তি।

সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা, পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥ —চৈঃ মঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন আরও বললেন—

বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ'-প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন॥

অভিধেয় নাম—'ভক্তি' প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ—শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

"বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

—গোঃ তাঃ উঃ বিঃ ৭৯

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।

অজিত, অদৃশ্য ও অব্যক্ত পরমপুরুষকে কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই জয় করা সম্ভব। ভক্তের কাছে পরাজয় স্বীকার করেও শ্রীভগবান আনন্দলাভ করে থাকেন। তাই ভক্তপ্রবর শ্রীধর বলেছেন—

'ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপ বামা ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯ অঃ

মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমভক্তির ঋণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হয়েও পরিশোধ করতে সমর্থ হননি, তাই শ্রীরাধার ভাব-কান্তি ধারণ করে তাঁকে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল। এবং রাধা ভাবে আকুল হয়ে ভূমাকে আবার ভূমিতে নেমে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে হয়েছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই জীবের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে বলেছেন—

ব্রহ্ম—পূর্ণজ্যোতিঃ, জীব—জ্যোতিঃকণা ॥
"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
"সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় ॥

[জ্যোতিঃ অর্থাৎ—কিরণ কিরণমালী সূর্যে সংযুক্ত হয়েও যেরূপ নিজেকে সূর্য্যের নিত্যাশ্রিত দর্শন করে তদ্রূপ।]

—চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি, কৃষ্ণে করে আদর॥"

—প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ধর্ম্মসংস্থাপক—তিনি সনাতন ধর্ম্মের অধিদেবতা। যে সকল ঐতিহাসিকগণ তাঁকে শুধুমাত্র একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন—তারা গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের দার্শনিক বিচার এবং তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আমরা যদি যথাযথভাবে অনুধাবন করি—আমরা শুধুমাত্র পরমার্থের অধিকারই পাব না, এই মরজগতেও তাঁর শিক্ষা, তাঁর দার্শনিক বিচার এবং তাঁর প্রেমধর্ম্ম অনুসরণে জাগতিক মঙ্গল বিধানেও সমর্থ হবো।

কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নীতি-মূলক, যুক্তিমূলক এবং পরমার্থমূলক এবং সমগ্র জগতকে, সকল বর্ণ, পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা, স্বধর্মী, বিধর্মী, অবহেলিত, উপেক্ষিত, ভেদবুদ্ধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন মানব সমাজে এক মহামিলনের অভয়বাণী স্বরূপ।

ধর্ম্মকলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক দার্শনিক তর্কদ্বারা বিভ্রান্ত—এবং ভেদবুদ্ধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে—শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী ও ধর্ম্ম অমৃতস্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অনুপম রূপ ও অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তিনিই কৃষ্ণতত্ত্বকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকটে যাবার পর জীবের প্রতি পরম করুণায় তাঁর অনুগামী ভক্তগণ—মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নাম-প্রেম ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-তত্ত্বকে উচ্চে ধরে রয়েছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম চণ্ডাল॥

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
করিবেক সম্মান বহুমান্য করি॥

তিনি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখিয়েছেন।

বৃন্দাবন লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাগণকে বলেছিলেন—

পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাত পাহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্প ফলচ্ছায়া—মূলবল্কল দারুভিঃ।
গন্ধ নির্য্যাস ভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥

—ভাঃ ১০।২২।৩২।৩৪

তোমরা কেবল মাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান এই বৃক্ষগণকে দর্শন কর। এরা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করে আমাদের তজ্জন্য-জাত কষ্টাদি নিবারণ করছে। এরা সমস্ত জীবের জীবিকাস্বরূপ, অতএব এদের জীবন ধন্য। সজ্জনগণের নিকট থেকে যেমন যাচকগণ বিমুখ হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, এদের নিকট থেকেও যাচকগণ তদ্রূপ বিমুখ হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। এরা পত্র, পুষ্প. ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি এবং পল্লবাদি ও অঙ্কুর প্রদানে সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করছেন।

গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনও কৃষ্ণভজনের শিক্ষায় বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তমা হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'—অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যে কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ —চৈঃ চঃ অ ২০ পঃ

এর চেয়ে বড় আর কোন মানবিক ধর্ম্ম আছে কিনা আমি জানি না। বৈষ্ণব হওয়া সহজ নয়। বৈষ্ণববেশে কোন অসাধু ব্যক্তি যদি আমাদের প্রতারিত করে থাকেন কখনও, সেই অপরাধে আমরা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি না। বৈষ্ণব যে ফোঁটা তিলক ধারীই হবেন—তেমনও কোন কথা নেই, যাকে দেখলে কৃষ্ণকথা মনে আসবে তিনিই তো বৈষ্ণব। শুধু বৈষ্ণব কেন, 'কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' জেনে সকল জীবের প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধাবান হ'তে হ'বে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তো এমন শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

নামপ্রেমের মালা গেঁথে তিনি জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠেই পরিয়ে দিয়েছেন।

'নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার'.

১৯৭২ সালের ১২ই জুলাই আর এক নূতন রূপ দেখলুম পৃথিবীর। ১৯৭২ সালের বারই জুলাই দেখলুম কোলকাতার চৌরঙ্গির ভীড় ঠেলে 'জয় জগন্নাথ' বলে একদল বিদেশী সাহেব রথ টানছেন। বাঙালী অবাঙালী অসংখ্য ভারতীয় তথাকথিত সাহেব-সুবোদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। হরেকৃষ্ণ সোসাইটির এই রথযাত্রা মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখবার মতোই।

এলবার্ট ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে, ক্যামাক ষ্ট্রীট্, পার্ক ষ্ট্রীট্, চৌরঙ্গি

হয়ে চিৎপুরের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির পর্য্যন্ত এই রথ টানা হয়। সুসজ্জিত রথোপরি রয়েছেন—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। পুরোহিত ক্যানাডীয়ান সাহেব 'ভবানন্দজী' যাত্রামন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁর পাশে থেকে খোল আর মন্দিরা বাজাচ্ছেন ন্যুইয়র্কের দুই সাহেব—'অচ্যুতানন্দ' আর 'পাঞ্চজন্য'। মেমসাহেবরাও রয়েছেন সেই রথযাত্রার মিছিলে। ঠাকুরকে চামর ব্যজন করছেন ন্যুইয়র্কের মেমসাহেব 'নারায়নী'।

রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে তারা চলেছেন রথ নিয়ে। সেই রথের রশি টানছেন—দেশী বিদেশী ভক্তবৃন্দ। মাঝখানে কীর্ত্তন করতে করতে ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে চলেছেন নগ্নপদে, তুলসীকণ্ঠী, রসকলি শোভিত সাহেব-মেমরা। যাদের আমরা এতদিন অন্য পোষাকে দেখতে অভ্যস্ত। এবং যাদের আমরা ভোগবাদের মূর্ত্ত প্রতীক ভাবতেই অভ্যস্ত। ফরাসী শ্রীমতী অ্যালান কীর্ত্তনানন্দে নাচছেন 'মালতী' নাম নিয়ে বাঙালী মেডিক্যাল ছাত্রী রীতার হাত ধরে। নাচছে আবার পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে—অ্যালানের (মালতীর) চার বছরের বাচ্ছা মেয়ে 'সরস্বতী'। পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে সহস্র ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি সে-দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছি। এ এক আশ্চর্য্য রথযাত্রার মিছিল। হরেকৃষ্ণ সোসাইটি এ রথযাত্রার উদ্যোক্তা।

আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলুম কি এমন মহাধন লাভ করে—ন্যুইয়র্কের সাহেব-মেমরাও ন্যুইয়র্কের ভোগ জীবনকে হেলায় তুচ্ছ করে ভারততীর্থে এসে উপনীত হয়েছেন। উত্তর পেলাম মনের মধ্যে থেকেই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্র নন্দন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই তো হরিনামের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরই অনুগামী কোন মহাভক্ত বৈষ্ণবের সান্নিধ্য পেয়ে এরা নিশ্চয়ই ধন্য হয়েছেন। তাই ন্যুইয়র্ক, প্যারিস, অটোয়া বা মন্ট্রিলের, ভোগজীবনকে তুচ্ছ করে ভারত তীর্থে এসে সমবেত হয়েছেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ ॥

মহাভাগ্যবান্ এঁরা সকলেই। আমরা এতকাল থেকেও সামান্য ভোগজীবনকে তুচ্ছ করতে পারলুম না, আর ওরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দেশের লোক না হয়েও পরমানন্দের সন্ধান পেল, অতি সহজেই ভোগ জীবনকে পেছনে ফেলে নামানন্দে মাতোয়ারা হ'তে পারল। অবশ্য ঈশ্বরের কৃপা তাঁর পরম প্রিয়জনের মাধ্যমে সাধারণ জীবের মধ্যে বর্ষিত হয়ে থাকে। বিশ্বাত্মার যিনি পরমাত্মা তিনি সমদর্শী, তাঁর কাছে কোন দেশই পরদেশ নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানই দূর নয়।

'হরেকৃষ্ণ' নাম প্রথমে মায়াবদ্ধ জীবদের কাছে রুচিপ্রদ নাও হ'তে পারে। কারণ আমাদের জিহ্বা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। আমাদের কর্ণ কেবলমাত্র আনকথা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ' এই মহামন্ত্র (ষোলনাম, বত্রিশ অক্ষর) যদি অনুদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়—নামে রুচি জন্মে। নামে রুচি জাগলেই, প্রেম সঞ্জাত হয়। প্রেম সঞ্জাত হ'লেই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা দূরীভূত হয়। কৃষ্ণ প্রেমের মহানন্দে ধনী হওয়া যায়। জাগতিক সকল সুখ এ আনন্দের কাছে অতি তুচ্ছ। এই ধরণের আনন্দ অনুমান মাত্র নয়, অবাস্তবও নয়।

পরম ভাগবত ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণচেতনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কৃপার অন্ত নেই। আমি তাঁর চরণপদ্মে প্রণতি জানাই। যাঁর অসীম কৃপা—ভোগবাদের মূর্ত্ত প্রতীক সাহেব মেমদেরও নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আশা করি তাঁর কৃপা থেকে আমি বঞ্চিত হ'বো না। এতৎসঙ্গে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভগবানের সকল প্রিয় জনের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাই।

বিশ্বের প্রায় সত্তরটি বড় বড় শহরের কিছু কিছু মানুষ কৃষ্ণ

চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। খোল করতাল বাজিয়ে তাঁরা হরেকৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। এই নাম, এমনই নাম যে মায়াবদ্ধ জী   যদি এই নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুদিন গ্রহণ করে, তারও নামে রুচি জন্মে। এবং নাম থেকেই প্রেম সঞ্জাত হয়। এবং নিরপরাধ ব্যক্তি যদি অনুদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নাম গ্রহণ করে—তবে সে অচিরেই পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়।

এই কৃষ্ণ-চেতনাকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা-প্রদায়ক সংস্থা। যার ইংরেজী নাম International Society for Krishna Consciousness (সংক্ষেপে—ISKCON)। লণ্ডনে, লস এঞ্জেলসে আমষ্টার্ডাম, মন্ট্রিল, সিডনী, নাইরোবী, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি শহরেও এই সংস্থার ভক্তগণ রয়েছেন—জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্ণ-চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

এই ISKCON সংস্থার মূলবক্তব্য—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা। গীতার সেই বাণীকেই তাঁরা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বময়ঃ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—তিনি ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ। অদৃশ্য অব্যক্ত হয়েও তিনি পরম করুণায় জীবের সাক্ষাৎ হয়েছেন।

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আজও কোন কোন ভাগ্যবান্ তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য।

পৃথিবীতে সেই অদৃশ্য, অব্যক্ত সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ বহুবার বহুভাবে মানুষের প্রতি করুণা বশতঃ এবং আপন রসাস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বলতে পেরেছেন—'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমারই শরণ লও।' কারণ তিনিই সকল অবতারগণের মধ্যে ঋষভ, শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাবতারী॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

—ভাঃ ১।৩।২৮

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

সব অবতারের করি' সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন ॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥

—চৈঃ চঃ আ ২।৬৮-৭০

সেই সর্ব্বেশ্বর নিখিল বিশ্বাত্মার যিনি পরমাত্মা সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অবহিত করাই ISKCON-এর মূল উদ্দেশ্য।

"ISKCON is now a world-wide community, practicising bhakti-yoga, a loving service to God."

তাঁরা নিজেদের আচরণের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পথে সাধারণ মানুষদের ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অবহিত করতে তৎপর হয়েছেন।

এই সংস্থার অনুগামীগণ মাংস, মাছ বা ডিম খান না, জুয়া খেলেন না, মদ্যপান করেন না—এমনকি ধুমপানও করেন না। কঠোর নিয়ম ও অনুশাসনের মাধ্যমেই—কৃষ্ণ চেতনা বিকাশে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন।

এই সংস্থার বিবাহিত অনুগামীগণ মাসে একবার মাত্রই 'সন্তানার্থে' স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয়ে থাকেন। তাঁরা অতি প্রত্যুষে জাগরিত হয়ে নিত্য এবং নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণচরণ বন্দনা করেন।

এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরম ভাগবত ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। প্রভুপাদ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৯৬৬

সালে এই কৃষ্ণ-চেতনা বিষয়ক আন্দোলন লস্‌এঞ্জেলস্ থেকে সুরু করেন।

ভোগবাদের উর্দ্ধে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হরিনামের মাধ্যমে সকল মানুষকে পরমার্থের সন্ধান দেওয়াই এই সংস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বীটলে, জর্জ্জ হ্যারিসন, অভিনেতা পিটার সেলার্স, স্যান্ ফ্র্যানসিসকোর মেয়র এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মতো বিখ্যাত লোকেরাও এই সংস্থার সান্নিধ্যে এসে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

লণ্ডনে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সেবাইত 'দয়ানন্দ'—(প্রথম জীবনে মার্কিন নৌবহরে কাজ করতেন) তিনি এক সাংবাদিককে বলেছেন—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন ভগবদ্ প্রেমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের সংস্থার মূল আদর্শ।'

"Krishna consciousness wants to spread purity and the love of God. This is not impractical."

মানুষ চিরকাল ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে নিজেকে ভালবেসে এসেছে। সে নিজেও জানেনা তার প্রকৃত স্বরূপ কি?

স্বার্থপরের মতো নিজেকে (যা তার আসল স্বরূপ নয়) ভালবাসার জন্যই মানুষের দুঃখ ও অভাব চিরন্তন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন ভগবানকে ভালবাসার মধ্যেই পূর্ণতা—এবং সকল দুঃখ, অভাববোধ ও সংশয়ের পরিসমাপ্তি।

বীরসিংহদাস এবং কৌশিক দাসও তাঁদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করেছেন। পূর্ব্বের সকল সংশয় ত্যাগ করে তাঁরাও কৃষ্ণভজনের মধ্যে চরমানন্দের সন্ধান পেয়েছেন। কৌশিক ছিলেন লিভারপুলের বাসিন্দা। তিনি একজন সাংবাদিককে বললেন: "Krishna consciousness is the most genuine process of spiritual realisation."

'He said, there were many other movements which he had tried but, none as genuine. By

becoming a devotee, he says he has lost all sense of anxiety and developed a love for god.

শ্রীকৌশিকের মতে কৃষ্ণ-চেতনার মাধ্যমেই ক্রমশঃ এই পৃথিবীর মনুষ্য সমাজেও বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করা সম্ভব। লক্ষ-লক্ষ লোক তাই তাঁদের এই কৃষ্ণ-চেতনা বিকাশ কার্য্যে ক্রমশঃ সাড়া দিচ্ছেন। শ্রীকৌশিকের মতে, একদল উন্মাদ লোক (a series of mad man) বর্ত্তমানে ক্ষমতার মসনদ অধিকার করে রয়েছেন। তারা মানুষকে মারার জন্য মারণাস্ত্র তৈরী করতেই বিশেষ আগ্রহী।

পৃথিবীর সত্তরটি শহরে ISKCON সংস্থার মন্দির রয়েছে, তন্মধ্যে একমাত্র বৃটেনেই পাঁচটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্ব-নির্ভরশীল মন্দির বিদ্যমান।

"Kaushika is quick to point out that everything the devoties have, how well or badly they do, is put down to will and mercy of Krishna. It is the eternal science of God consciousness described in vedic literature compiled some 5,000 years ago."

ISKCON সংস্থার অনুগামীগণ কেনিয়ার নাইরোবীতেও একটি নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাইরোবী মিশনের অন্যতম অনুগামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী বললেন : We are Krishna's army, dedicated to bringing about a peaceful revolution.'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত এবং জীবের প্রতি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহকে যিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন, আমি সেই পরমভাগবত ও ঈশ্বরের একান্ত প্রিয়জন প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

তাঁর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের ওপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হো'ক—এই প্রার্থনা জানাই।

সেই সঙ্গে বিনম্রচিত্তে প্রণাম জানাই পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে—যিনি নিজে সিদ্ধ মহাত্মা হয়েও জীবের প্রতি মমত্ববশে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে বলতেন : 'আন-কথা আর লাগে না ভালো। বলো বলো ভাই কৃষ্ণকথা বলো। তোমাদের হাতে ধরি, পায়ে পড়ি—বলো বলো ভাই কৃষ্ণ বলো।'

তিনি অপ্রকটে চলে গেছেন। দু'একবার মাত্রই আকুল ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর কণ্ঠের সেই গান শুনেছিলুম। কালের সীমা অতিক্রম করে তাঁর সেই আকুল আবেদন ইথারে ইথারে তরঙ্গ তুলে আমার বিষয়াসক্ত মনে এখনও বারবার অনুরণন তোলে। আমি পাপী, নরাধম—তাঁর কৃপা ধারণের যোগ্য আমি নই। তাই সকল বৈষ্ণব ও সাধুগণের চরণে প্রণতি জানিয়ে আবেদন জানাই, তাঁরা পরম করুণায় আমাকে তাঁর এবং তাঁদের কৃপাধারণের যোগ্য করে তুলুন। তাঁদের কৃপায় আমার মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সঞ্জাত হো'ক!

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন॥

-চৈ: চ: মধ্য ২: পৃ:

ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম্॥ —ব্রহ্ম সংহিতা

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

—চৈ: চ: আ: ৫ পৃ:

ভোগবাদকে তুচ্ছ করে—কবে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেমের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাব জানি না। যে দেহকে কেন্দ্র করে আমাদের ভোগ কামনা আবর্ত্তিত—সেই দেহ পরনিগ্রহযোগ্য ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য অর্থাৎ আগমাপায়ী।

কামান্ কাময়তে কামৈর্যদর্থমিহ পুরুষঃ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৌতি চ॥ —ভা: ৭।৭।৪৩

তাই শেষ কথা বলে যাই, চৈতন্য ভাগবতে যে-কথা বলা

হয়েছে—তার পুনরাবৃত্তি করে যাই, দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পাওয়া গেল যখন-

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥

—চৈতন্য ভাগবত আ ১৩ অঃ

'দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।' —ভাঃ ১১।২।২৯

কৃষ্ণপ্রেম সঞ্জাত হ'লে—মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে হবে, মুক্তিও তুচ্ছ মনে হবে—তুচ্ছ হবে ব্রহ্মানন্দও। তিনি যে আনন্দময়—তাঁকে ভালবেসে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দের তুলনা নেই।

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ মমলং প্রেমাপুমর্থোমহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ ॥

—শ্রীল বিশ্বনাথ

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, বৃন্দাবনই তাঁর লীলাভূমি ব্রজবধূগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত (আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেম,) উপাসনাই রম্যা, এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই আসল প্রমাণ বিশেষ, প্রেমই পুরুষার্থ শিরোমণি—এই মতেরই প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাতেই আদর, অন্য নহে।

পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীভগবানকে প্রণাম করে আশ্রিত-বৎসল ভগবানের কৃপা প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন—'ভগবান নিজেই কৃপাপরবশ হয়ে নিজের প্রাপ্তির উপায় ব্যক্ত করেন। তিনি যেমন মায়াদ্বারা জীবকুলকে বন্ধন করছেন, তেমনি কৃপাপরবশ হয়ে তিনিই শ্রীগুরু, শাস্ত্র ও পরমাত্মারূপে এবং বিশেষ কৃপা প্রকল্পে নিজে অবতীর্ণ হয়ে নিজকে প্রকট করে জীবকুলকে মুক্ত করেছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু আত্মারূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান

—চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

তিনিই আবার স্বয়ং বেদবক্তা হয়ে মুনিগণের বিভ্রান্তি দূর (মুনিগণ বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব ভক্তিযোগ পরিহার করে জ্ঞানযোগাদির প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন) করে সঠিক বেদার্থ নিরূপণের দ্বারা ভক্তি-যোগের প্রাধান্য উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে॥

—চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তাঁর প্রিয়জন অর্থাৎ তাঁর ভক্তগণের মাধ্যমেই সাধারণ জীবে বর্ষিত হয়। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা যায় না। অতএব জীবে 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান' জেনে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া প্রয়োজন। কৃপা লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

'লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে॥

—চৈতন্য ভাগবত অ ৯ অঃ

কৃষ্ণতত্ত্ব যথার্থভাবে একমাত্র ভাগ্যবান্ রসিক ব্যক্তিগণের উপলব্ধির বিষয়। কবি চণ্ডীদাস তাই শ্রীরাধার মাধ্যমে বলেছেন—

মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিকের বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥

রসিক বিনা এ রসের কথা কারো জানা সম্ভব নয়। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেমে যে কি আনন্দ—তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চার

পরমপুরুষ, স্বাধীন ও স্বরাট শ্রীহরি রয়েছেন আত্মধ্যানে মগ্ন হয়ে। নিজেকে নিজে ভোগ করতে হ'লেও ভালবাসা প্রয়োজন। ভালবাসা আবার একাকী হয় না, একাধিক দরকার। তাই ভালবাসার প্রয়োজনেই পরম পুরুষ শ্রীহরি—এক থেকে হ'লেন দুই। দুই থেকে আবার তিন। তিনি সৎ, পৃথিবীকরণে চিৎ—দুইয়ের সম্ভোগে উৎসারিত হ'লো আনন্দ। সেই জন্যই তিনি সচ্চিদানন্দ। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই বিষয়। যাঁকে পৃথক করলেন—তিনি আশ্রয়। বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

—চৈঃ চঃ

কৃষ্ণপ্রেমের মহাভাবে ভাবিতা মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা। তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই নিজশক্তি।

আনন্দচিন্ময়রস—প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—ব্রহ্মসংহিতা

আদি পুরুষ গোবিন্দ, আমি তাঁকেই ভজনা করি। সর্ব্বভূতের আত্মারূপে তিনি, গোলকেই তাঁর অবস্থিতি। তাঁর সঙ্গিনী হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা গোপীগণ, তাঁর আনন্দ-চিন্ময় রস থেকে সঞ্জাত।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনীপরা॥

—বৃহদগৌতমতন্ত্র

আনন্দদায়িনী পরমা দেবী শ্রীরাধা কৃষ্ণস্বরূপা। তিনিই

নিখিলশ্রী, বিশ্বকান্তি ও দিব্যরূপ সম্মোহিনী। শ্রীরাধা চির অতুলনীয়া, চির অনন্যা।

পুরাণে, উপপুরাণে, কাব্য-নাটকে, তন্ত্রে—মানুষ ও ঋষিগণের দিব্য-কল্পনা সীমিত গণ্ডীকে ছাড়িয়ে সুদূর প্রসারী হয়েছে। কিন্তু সে সকল পুরাণ, উপপুরাণ বা কাব্য-নাটকে—এমন কারো সন্ধান পাওয়া যাবে না, যার সঙ্গে শ্রীরাধার তুলনা করা চলে। শ্রীরাধা চির অনন্যা। চির-অতুলনীয়া।

পুরাণে কথিত আছে যে, একবার দেবতারা আর দানবেরা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন—এবং সেই মথিত সমুদ্র থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন কমলালয়া মহালক্ষ্মী। সেই কমলালয়া শ্রীদেবীই সর্ব্ব সম্পদের অধিষ্ঠাতৃ সৌন্দর্য্যময়ী মহালক্ষ্মী। ক্ষীরসাগর তীরে ভুজগ শয়নে শায়িত নারায়ণের তিনি পাদ সম্বাহনে নিরতা।

চণ্ডীর প্রথম চরিতের অধিষ্ঠাতৃ দেবী মহাকালী। তিনি যোগ-নিদ্রা, শ্রীহরির নেত্র থেকে অন্তর্হিতা হয়ে—শ্রীহরিকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীহরি মধু ও কৈটভকে বধ করেছিলেন। চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিতের অধিষ্ঠাতৃ দেবী স্বয়ং মহিষাসুরমর্দ্দিনী। চণ্ডীর তৃতীয় চরিতের দেবী মহাসরস্বতীরূপা। এই মহাদেবীই শুম্ভ নিশুম্ভকে হত্যা করেছিলেন।

'কেন' উপনিষদের উমাই হৈমবতী ব্রহ্মস্বরূপা। এঁর দুই রূপ, দাক্ষায়ণী ও পার্ব্বতী। দক্ষালয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন তিনি, এবং বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষ যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হয়ে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। এই দাক্ষায়ণীই আবার নগাধিরাজের কন্যা পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনিই আবার ভোলা মহেশ্বরের সুগৃহিণী। হর-পার্ব্বতীকে কেন্দ্র করে স্মরণাতীত কাল থেকে কত কাব্যগাথা, কত কাহিনী। দেবী পার্ব্বতীই আবার জগতে অন্নদাত্রী রূপে অন্নপূর্ণা। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে, মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভবে—এই মহাদেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই মহাদেবীকেই আবার আর একরূপে দেখা যায়। ইনিই মধু-কৈটভ বধের কারণ। অতিদর্পী মহিষাসুরও এই মহাদেবীর হাতেই নিহত হন।

আরও এক দেবীর কথা আমাদের পুরাণে রয়েছে—তিনি বাক্-দেবী সরস্বতী। এই দেবীর অনেক নাম—প্রাণীর কণ্ঠে কণ্ঠে এই মহাদেবীর অধিষ্ঠান। তাঁর কৃপাতে আমাদের বাক্য স্ফূরণ হয়। তিনি শুধু বিদ্যারূপিনীই নন, যাবতীয় ললিত-কলারও অধিষ্ঠাতৃ দেবী তিনি। কোন কোন পুরাণে লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে সহোদরা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং দেবাদিদেব মহাদেবই তাঁদের জনক।

আর এক মহীয়সী নারীর কথাও পুরাণ থেকে জানতে পারি,—তিনি সতী সাবিত্রী। যিনি যমের হাত থেকে মৃত স্বামীর দেহে জীবন ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পুরাণ থেকে সমুদ্র সম্ভবা আর এক রমনীর কথা জানা যায়—তিনি উর্বশী। উর্বশী রহস্যময়ী। বিশ্বকবি যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ; তুমি শুধু প্রেয়সী।' স্বর্গ সুখের অধিকারী যে-কোন পুরুষেরই তুমি উপভোগ্যা। তুমি পুরুষের সুখ-সঙ্গিনী।

কিন্তু এদের কারো সঙ্গেই শ্রীরাধার তুলনা হয় না। তিনি স্বকীয় মাধুর্য্যে অনন্যা।

যেখানে ভূমি চিন্তামণিময়, বারিধারা মাত্রেই অমৃতস্বরূপা, যেখানকার তরুগণ কল্পতরু, লতা মানেই কল্পলতা, ধেনুগণ কামধেনু, যেখানকার নরনারীর কথাবার্তা গানের মতো মধুর। যাদের গমন মানেই নৃত্য—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্যলীলাস্থলী বৃন্দাবনের বনদেবী। তিনি চির-কিশোরী—তাই তিনি রাই কিশোরী। রস স্বরূপ, আনন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই তাঁর প্রাণবল্লভ।

'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই।' শ্রীরাধা ব্যতীত বৃন্দাবনের কথা ভাবা যায় না।

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকর মকরন্দস্য মধুরে।
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃত মধুপবৃন্দ মুহুরিদম্ ॥
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে।
মর্মানন্দং বৃন্দাবিপিন মতুলং তুন্দলয়তি ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।৪১,

'আম্রমুকুলের সুরভি ও মধুর মধুধারায় বন্দী ভ্রমরকুলের কল-গুঞ্জনে এই বৃন্দাবন মুখরিত। এবং মন্দ মন্দ মলয় বাতাসে তরঙ্গিত বৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দকে প্রবর্দ্ধিত করেছে।'

যে বৃন্দাবন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আনন্দ নিকেতন—সেই বৃন্দাবনই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।৪২

এই বৃন্দাবনের চারিদিকেই দিব্য লতাসমূহ। লতাসমূহের অগ্র-ভাগে বিকশিত পুষ্পের সমারোহ। সেই বিকশিত পুষ্পসমূহে বসে রয়েছে আনন্দিত ভ্রমরের দল। সেই ভ্রমরেরা শ্রুতিমধুর গান গাইছে।

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লী পরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফল পালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।৪৮

কোথাও ভ্রমরীর গুঞ্জন, কোথাও মলয় প্রবাহের শীতলতা, কোথাও লতার নৃত্য, কোথাও মল্লিকার সৌরভ, কোথাও বা রসাল ডালিমফল গুচ্ছের সমারোহ। এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়সমূহে আনন্দ প্রদান করছে।

বৃন্দাবনের পরিবেশ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রবর্দ্ধনকারী। তাই বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়।

বর্ষার স্রোতস্বিনী নদীর প্রবল জলবেগ যেমন পাহাড় পেরিয়ে, শিলাখণ্ডকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হয়। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাও তেমন কৃষ্ণপ্রেমের আকুল আবেগে সংসারধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম (সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে), গুরুজনকে লঙ্ঘন করে—দুস্ত্যজ্য পতিকে পরিহার করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥

*　　*　　*

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

—চৈঃ চঃ

শ্রীরাধারও সংসার ছিল, সমাজ ছিল, গৃহ ছিল, স্বজন ছিল—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যই তিনি সবকিছুই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর প্রীতিসম্পাদনের জন্য দুঃখ বরণ করতেও শ্রীরাধা আনন্দ পেতেন। সুখ—স্বরূপের সুখ সম্পাদনের জন্য দুঃখবরণ করতে কোন কুণ্ঠা ছিল না শ্রীরাধার। কোন বাধাই তাঁর অভিসারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নাই।

শ্রীরাধার আবির্ভাবও দুর্জ্ঞেয় রহস্য দ্বারা আবৃত। পুরাণে, তন্ত্রে শ্রীরাধার আবির্ভাব প্রসঙ্গে নানান বর্ণনা রয়েছে।

পুরাণে শ্রীরাধাকে বৃষভানু নন্দিনী বলা হয়েছে। আচার্য্য নিম্বার্ক শ্রীরাধাকে উপাস্যারূপে গ্রহণ করেছেন। আচার্য্য নিম্বার্কও শ্রীরাধাকে বৃষভানু নন্দিনী বলেই বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ তাঁকে রাসোদ্ভবা বলেছেন। শ্রীরাসমণ্ডলেই তাঁর আবির্ভাব।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর নাটকের মাধ্যমে শ্রীরাধা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেছেন: হিমাচলকে কন্যা-গৌরবে বিশেষ গৌরবান্বিত দেখে—বিন্ধ্য পর্বতও কন্যালাভের জন্য তপস্যা করেন। এবং তপস্যাবলে বিন্ধ্য পর্বত দু'টি কন্যা লাভ করেন। কিন্তু কন্যা সন্তান দু'টি ভূমিষ্ঠ হবার ঠিক পর মুহূর্তেই এক রাক্ষসী কর্তৃক অপহৃতা হয়। বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস মারণমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সেই রাক্ষসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করেন, রাক্ষসী তখন ঐ কন্যা দু'টি শ্রীবৃন্দাবনের শতদল শোভিত এক সরোবরে নিক্ষেপ পূর্বক পলায়ন করে। বৃষভানু ঐ সরোবরস্থিত শতদল-শয্যাতে কন্যা দুইটি লাভ করেন। ঐ দুইটি কন্যার একজন শ্রীরাধা অপর-জন শ্রীচন্দ্রাবলী।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বার্থসাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥

—উজ্জ্বল নীলমণি॥ বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণে।

শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে—শ্রীরাধাই সর্ব্ব রকমে শ্রেষ্ঠা। অতুলনীয় গুণশালিনী এবং মহাভাবস্বরূপা।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তৎচরিত প্রেমোম্ভোজ মকরন্দ স্তোত্রে শ্রীরাধার রূপের সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

প্রায় সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই মতে—মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী শক্তি। মূলতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ।

জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের পরমান॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

—চৈঃ চ

রাধা ও কৃষ্ণের একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত—ভক্তজনের আনন্দ প্রবর্দ্ধনের নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশ মাত্র। মৃগমদ থেকে যেমন তার গন্ধ, অগ্নি থেকে যেমন তার দাহিকা শক্তি পৃথক নয়—তেমনি শ্রীকৃষ্ণ থেকেও শ্রীরাধা পৃথক নয়—অবিচ্ছেদ্য বিধায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মক।

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের বর্ণনা রয়েছে ঃ—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গু'ণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চালাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা। গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীত—প্রসারাভিজ্ঞা রম্যবাক নর্ম্মপণ্ডিতা ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষ—তর্ষিণী।
গোকুল প্রেমবসতির্জ্জগৎ-শ্রেণী-লসদ্‌যশা ॥
গুর্ব্বর্পিত—গুরু-স্নেহা সখী—প্রণয়িতা বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥
বহুনাং কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ ঃ—শ্রীরাধা মধুরা ও নবীনা কিশোরী। শ্রীরাধার কটাক্ষ বঙ্কিম ও চপল—তাঁর হাসিটি উজ্জ্বল। তাঁর করতল ও পদতলের রেখাগুলি সৌভাগ্যসূচক। তাঁর দেহগন্ধে মাধবও উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। শ্রীরাধা সঙ্গীতেও পারদর্শিনী। বাচনভঙ্গী এবং বাক্যবিন্যাসও তাঁর সুন্দর। তিনি পরিহাসে নিপুণা, বিনীতা, দয়াময়ী—কলাবিলাসে কুশলা ও গৃহকর্ম্মে নিপুণা। লজ্জাশীলা ও মানময়া। তাঁর ধৈর্য্য আছে, গাম্ভীর্য্য আছে—আর

আছে সুন্দর বিলাস। শ্রীরাধার মধ্যে তাই মহাভাব চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। গোকুলের প্রেমমাধুর্য্যের নিলয়ও তিনি। তাঁর যশ সমগ্র ভুবনময় ব্যাপ্ত। গুরুজনের প্রতিও ইনি প্রগাঢ় ভক্তিযুক্তা। সখীদের প্রণয়ে বশীভূতা, কৃষ্ণপ্রিয়াদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীরাধার বশীভূত। আর অধিক কি? শ্রীকৃষ্ণের মতোই শ্রীরাধা অনন্তগুণ সম্পন্না।

বলাদক্ষোর্লক্ষী:
কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং
কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টা—
পদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি—
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ,
কিমপি কিলং রূপং বিলসতি ॥

—বিদগ্ধমাধব (শ্রীরাধারূপ বর্ণনা) ১।৬০

শ্রীরাধার বিচিত্র আর এক অনবদ্য রূপ। তাঁর নয়নের শোভা যেন পদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করছে। তাঁর মুখের উল্লাস প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের শোভাকেও হার মানিয়েছে, আর তাঁর অঙ্গের কান্তি স্বর্ণকেও বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করেছে।

শ্রীরাধার রূপের প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত! শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥

—বিদগ্ধমাধব (শ্রীরাধারূপ বর্ণনা) ৫।৩১

দিবানিশি রূপমাধুর্য্যে উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার মুখের সঙ্গে আর কার তুলনা হ'তে পারে? চাঁদের সঙ্গে কি তুলনা করব? দিবা সময়ে চাঁদতো রূপহীন। পদ্মের সঙ্গে তুলনা করব? কিন্তু পদ্মও সন্ধ্যাবেলা (ঝরে যায় বা শুকিয়ে যায়) রূপহীন হয়ে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধারূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—

প্রমদ—রসরতঙ্গস্মের—গণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধি—ভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্‌ক্ষীৎ পক্ষলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥

—বিদগ্ধমাধব ২।৭৮

শ্রীরাধার কপোলে (গণ্ডে, গণ্ডস্থলে) আনন্দ-রস-তরঙ্গে মাধুর্য্য-মণ্ডিত মৃদু হাস্য। মদনের ধনুর ন্যায় তাঁর ভ্রূলতা—সদ্য নৃত্যরতা। নয়নের পলকসমূহ দীর্ঘক্ষণ বিলম্বিত। তাঁর কটাক্ষ মদমধুর ও চঞ্চল ভ্রমরের মতো। সেই কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করেছে।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপী মণ্ডল—মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩

গোপীমণ্ডল পরিশোভিত রাসলীলা সুরু হ'লো। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কণ্ঠালিঙ্গন করে—প্রতি দু'জন গোপীগণের মধ্যবর্ত্তী হ'লেন। প্রত্যেক গোপাঙ্গনাই মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিকটেই রয়েছেন।

অনেকত্র প্রকটতা রূপসৈকস্য যৈকদা
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

—লঘুভাগবতামৃত (পূঃ খণ্ড) ১।২১

একই সময়ে বহুস্থানে একটি বিগ্রহের যে স্বরূপে একাধিক আবির্ভাব—তাকেই প্রকাশ বলা হয়।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই এরূপ প্রকাশ সম্ভব।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।৪২

শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে বললেন—আমার আর ভেদ মোহ নেই, কারণ আমি জেনেছি, বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে নানাভাবে প্রকাশিত হ'লেও সূর্য্য যেমন এক—তেমনি নিজসৃষ্ট প্রাণীদের হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হ'লেও সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে জন্মরহিত অর্থাৎ এক।

অতএব দেবকীর উদরে জন্মগ্রহণ বিষয় একটি বাদমাত্র,—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর। তিনি স্বাধীন ও স্বরাট। তিনি পুরুষোত্তম। তাঁরই তর্কাতীত ও অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে লীলা বিলাস। এই লীলা বিলাস সাধারণ মানুষের কাছে চির রহস্যময় হ'লেও—ভক্তজনের আনন্দপ্রবর্দ্ধক।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৬

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই মানুষের দেহ ধারণ করে—তাঁর এই লীলা প্রকাশ। সেই লীলার কথা শুনে যেন লোকে ভগবৎ পরায়ণ হয়ে ওঠে।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা বিলাসের প্রধানতম আশ্রয়। তিনি আনন্দদায়িনী তিনি কৃষ্ণময়ী।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে ॥

—চৈঃ চঃ

* * *

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।২৮

অন্যান্য গোপীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরাধার কথা উল্লেখ করে বলছেন—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই শ্রীরাধা

একশ' পঁয়তাল্লিশ

সেবায় প্রীত করেছে, কেননা গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে, তাঁকে নিয়ে প্রীতমনে নির্জ্জনে গমন করেছেন।

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগ) প্রথম লহর ১২৪

শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সকে সফল করে কুঞ্জে বিহার করছেন। শ্রীরাধিকার বুকে পত্ররচনা করে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এবং রজনীর রতিকলায় শ্রীরাধা কেমন প্রগলভা হয়েছিলেন—সখীদের সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করে শ্রীরাধাকে লজ্জায় নিমীলিতলোচনা করেছেন।

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।৯

শ্রীপৌর্ণমাসী বৃন্দাদেবীকে বলছেন—হে মধুরনয়নে, কৃষ্ণ যদি মথুরায় অবতীর্ণ না হ'তেন, যদি অবতীর্ণ না হ'তেন রাধিকা—তবে সৃষ্টিই বিফল হ'তো, বিশেষ করে বিফল হ'তো মকরকেতু (অর্থাৎ কামদেব)।

"কস্মাত্বন্দে প্রিয়সখি"
"হরেঃ পাদমূলাৎ" "কুতোঽসৌ"
"কুণ্ডারণ্যে" "কিমিহ কুরুতে"
"নৃত্যশিক্ষাং" "গুরুঃ কঃ।"
"ত্বং ত্বন্মূর্ত্তিঃ" প্রতিতরুলতাং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো
নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥"

—বিদগ্ধমাধব (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত) ৮।৭৭

শ্রীরাধা বৃন্দাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ—কোথা থেকে এলে প্রিয়-সখি বৃন্দে ?

ঃ আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল থেকে এসেছি।

শ্রীরাধা আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় ?

ঃ রাধাকুণ্ড বনে।

ঃ সেখানে তিনি কি করছেন ?

ঃ নৃত্যশিক্ষা করছেন ?

শ্রীরাধা বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কার কাছে নাচ শিখছেন তিনি ? গুরু কে ?

বৃন্দাদেবী তখন বললেন—'দিকে দিকে প্রতি তরুলতার তলে তোমার যে মূর্ত্তি প্রধানা নটির মত হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ তারই পিছু পিছু নেচে চলেছেন।

নিজ প্রেমাস্বাদে হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ॥

—চৈঃ চঃ

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগ॥

—বিদগ্ধমাধব (দানকেলি কৌমুদী)

শ্রীকৃষ্ণে রাধার অনুরাগ জয়লাভ করুক। রাধার অনুরাগ—সর্ব্বব্যাপী হয়েও প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীল, শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরাগ গৌরবান্বিত হয়েও অনুদ্ধত, নব নব বিলাসে কুটিল হয়েও—নির্ম্মল-প্রেমের মতোই সরল।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে একাত্ম রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণের পক্ষেও দুর্লভ ছিল শ্রীরাধা তথা ব্রজগোপীগণ সেই একাত্ম লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎ-প্রেক্ষণে, দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভিহৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮২।৩৯

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন—'হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে একাত্ম রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণের দুর্লভ ছিল—সেই একাত্ম (নিবিড় সান্নিধ্য) গোপীগণ লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁদের হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত ছিলেন—ছিলেন ইপ্সিত। যাঁর সৌন্দর্য্য দর্শনকালে গোপীগণ নিমেষপাতকেও অসহনীয় বলে বোধ করতেন, সেই কৃষ্ণকে দীর্ঘদিন পরে কুরুক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে গোপীগণ তাঁকে দৃষ্টি দিয়েই পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করেন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত—
স্তথাং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী—পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

—শ্রীরূপগোস্বামি কৃত শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় লীলাস্থলী আর কুরুক্ষেত্রে পার্থক্য অনেক। তাই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে সখীগণকে বললেন—'সখি' কুরুক্ষেত্রে দেখা পেলাম যাঁর, তিনিই তো আমারই সেই দয়িত কৃষ্ণ। আমি সেই রাধা। আমাদের মিলনও সেই রকমই। তবু যমুনা পুলিনের সেই যে বনে বাঁশরীর পঞ্চম সুরের যে মধুর সুর লহরী জেগে উঠত, সেই সুর শোনার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

বৃন্দাবনের গোপীগণ ধন্য, কারণ কেবলমাত্র তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের নয়ন বিমোহন রূপ নয়ন ভরে পান করতে সমর্থ হয়েছেন।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্যরূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্‌।

দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ,

মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৪।১৪

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—লাবণ্যের সার, অতুলনীয়, স্বভাবসুন্দর প্রতিক্ষণেই নূতন, দুর্লভ, মাধুর্য্যের, সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়। গোপীগণ এমন কোন তপস্যা করেছিলেন যে—এমন রূপ নয়নভরে পান করতে সমর্থ হয়েছেন।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন।

কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥

—চৈঃ চৈঃ

শ্রীরাধা তথা গোপীগণের কৃষ্ণানুরাগ তুলনারহিত; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য লৌকিক ধর্ম্ম, বেদোক্ত ধর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম, সাংসারিক কর্ম্মাদি, দেহ সুখ, আত্মসুখ, নিজ পরিজন, এমনকি পাতিব্রত্য ধর্ম্মও পরিত্যাগ করেছিলেন। স্বজনগণের তাড়ন-ভৎর্সন ও স্বীয় সুখ উপেক্ষা করে—একমাত্র কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যেই নিজেদের সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রীরাধা তথা গোপীগণ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ ভালোবেসেছিলেন—তাঁর তুলনা কোন গ্রন্থে, এমনকি কাল্পনিক কাব্যগ্রন্থের নায়িকাদের মধ্যেও দুর্লভ।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ॥

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ

কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।১৯

শ্রীরাধা তথা গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম যে তুলনা রহিত—তা নিম্নের উক্তি থেকেই ধারণা করা সম্ভব।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—হে প্রিয়। পাছে তোমার কোমল চরণে ব্যথানুভব হয়—তাই আমাদের কঠিন স্তনসমূহে তোমার চরণ যুগল ধীরে ধীরে ধারণ করেছিলুম। এখন তুমি কিনা সেই সুকোমল পা নিয়ে অরণ্যপথে ভ্রমণ করছ, কঠিন কঙ্করে কি তোমার পায়ে ব্যথা লাগছে না? একথা ভেবে ভেবে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

এ ধরণের ভালবাসার নিদর্শন আর কোন কাব্যে-সাহিত্যে আছে কনা আমার জানা নেই।

আত্মসুখে দুঃখে গোপীর নাহিক্ বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥ —চৈঃ চঃ

সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপীগণকে বলেছেন—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ—
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়া॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২১

'আমার প্রেমে তোমরা সংসার ত্যাগ করেছো, ধর্ম্মাচার ত্যাগ করেছো, আপনজনদের তোমাদের নিরন্তর অনুরাগ আস্বাদনের বা বৃদ্ধির জন্যই আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়া—আমি তোমাদের প্রিয়, আমাকে নিরপরাধ মনে করো।

গোপীগণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতুসাধুনা।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২

'আমি দেবতাদের মতো দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েও তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করতে সমর্থ হবো না। দুর্জ্জয় গৃহবন্ধন ছিন্ন করে তোমরা অনন্যভাবে আমাকেই ভজনা করেছ। তোমাদের আপন প্রেমেই —আমার ঋণ পরিশোধ হো'ক।'

স্বরাট, স্বাধীন, তথা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা তথা গোপীগণের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হন্‌নি।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্।

—গোপীপ্রেমামৃত।। শ্রীকৃষ্ণবাক্য 'শ্রীমদ্ভাগবত'

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের কাছে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেম সম্পর্কে বলেছেন—হে পার্থ! আপন আপন দেহকেও গোপীগণ আমার বস্তু মনে করে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য কাজে লাগবে বলে) প্রসাধিত করতেন। হে অর্জ্জুন!—সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার পরম প্রেমভাজন আর কেউ নেই।

ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা
মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকাঃ
মামেবং দয়িতং প্রেষ্ঠম
আত্মানং মনসা গতা।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৪৬।৩৪

'আমাকে তাঁরা (গোপীগণ) মন সমর্পণ করেছে, প্রাণ সমর্পণ করেছে' সব কিছুই সমর্পণ করেছে। আমিই তাঁদের একমাত্র দয়িত, তাঁদের প্রিয়তম আত্মস্বরূপ। আমাকে তাঁরা অন্তরে তাই একান্ত করে পেয়েছে।'

শ্রীল রূপ গোস্বামী তৎচরিত স্তবমালায় কেশবাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে বলেছেন—

উৎপত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং,
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।

স্তনস্তবকসঙ্কয়ন্নয়নচঞ্চরী কাঞ্চলং,

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

আমি কেশবকে ভজনা করি। কেশব বন থেকে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। তাঁকে ব্রজরূপসীগণ স্মিতহাসি আর অপাঙ্গ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তাঁদের বক্ষকুসুমে লগ্ন হয়ে আছে কেশবের নয়নভৃঙ্গ।

"সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।

রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥" —চৈঃ চ

ব্রজললনাগণের মধ্যে শ্রীরাধাই রূপে গুণে এবং সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠা।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥

—পদ্মপুরাণ

রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়স্থান। রাধাই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রিয়া।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥

—গোপীপ্রেমামৃত ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন—হে পার্থ! ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবীই ধন্য, কারণ সেখানে বৃন্দাবন বিদ্যমান। বৃন্দাবনে গোপীরাও ধন্য, কারণ তাঁদের মধ্যেই রয়েছেন আমার রাধা।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিত্যলীলাস্থলী বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়—লতা মাত্রেই কল্পলতা, তরুসকল—কল্পতরু।

নির্ধূতামৃতমাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো

বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরুতশ্লাঘাভিদস্তেগিরঃ।

অঙ্গশ্চন্দন শীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্।

[illegible] ॥

রূপেকংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহতিহৃষ্যত্বচ।
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্ ॥
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধররসেন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং।
দম্ভোদগীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারা কুলাম্ ॥

—ললিতমাধব।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলছেন—হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুর্য্য পরিমলকেও হার মানিয়েছে; তোমার মুখগন্ধ পদ্মের সৌরভকেও জয় করেছে; তোমার কণ্ঠস্বরের কাছে কোকিলের কাকলির গৌরবও হার মেনেছে। তোমার অঙ্গ চন্দনাপেক্ষাও সুশীতল, তোমার তনু সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়। রাধে! তোমার সঙ্গে মিলনে আমার ইন্দ্রিয়কুল—অনুক্ষণ আনন্দে আকুল হয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণের রূপে রাধার নয়নও লুব্ধ হয়েছে, স্পর্শে রাধার ত্বক হয়েছে রোমাঞ্চিত, কৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য শ্রবণ হয়েছে ব্যাকুল, কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভে নাসা হয়েছে আনন্দে বিভোর, অধর রসে রসনা হয়েছে প্রলোভিত। তবু শ্রীরাধা কপটচ্ছলে কোনরকমে তাঁর শ্রীমুখপদ্ম আনত করে গর্ব্বভরে 'শ্রীকৃষ্ণের গরবে গরবিনী রাই' তাঁর মনোভাব গোপন করে রেখেছেন—কিন্তু দেহগত বিকার ঢেকে রাখতে পারছেন না, মিলনানন্দে তাঁর অঙ্গ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

প্রেমচ্ছেদরুজোহব গচ্ছতি হরি র্নাযং ন চ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ॥
অন্যে বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং
নো জীবনং বাশ্রবম্,
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হা হা বিধেঃ কা গতি ॥

—জগন্নাথবল্লভ নাটক ৩।৯

শ্রীরাধা মদনিকাকে বলেছেন—হায়! বিধাতার কি বিধান! দয়িত কৃষ্ণ আমার প্রেমভঙ্গের বেদনা কিরূপ তা' জানেন না। প্রেম

একশ' তিপান্ন

জানে কোনটা স্থান আর কোনটা অস্থান। কামদেব জানেন না যে আমরা ভীরু। একে অন্যের দুঃখ কেউ অনুভব করতে পারে না। হায়, তাই জীবন আমাদের দুঃখময়, যৌবনও দুদিনের মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ শুষ্কেনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।

—গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকে (২০ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ না দেখে গুণ না শুনে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিফল, বিফল আমার দিনগুলি। লজ্জাহীন হয়ে আমি যেন পাষাণের মতো। শুষ্ক ইন্ধনের (কাষ্ঠের) মতো ভারস্বরূপ হয়ে আছে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ! হায়! কি করেই বা আমি এই ভার বহন করি আর কি করেই বা দিনযাপন করি।

'বংশী গানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্তমন, সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সে নাসা ভস্ত্রার সমান ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত
সুধাসারস্বাদ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥
কৃষ্ণ কর-পদতল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার
সে বপু লৌহ সম গণি।'

শ্রীরাধা আক্ষেপ করে বলছেন—বংশীগীত রূপ অমৃতের আশ্রয়, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র। সেই মুখচন্দ্র যে নয়ন দর্শন করতে সমর্থ হোল না, সে নয়ন দিয়ে কিবা কাজ? অমন নয়নধারিণীর মাথায় বাজ পড়াই উচিত।

সখি! আমার দুর্দ্দৈবের কথা আর কি বলব! আমার এই দেহ, চিত্ত, আর সকল ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণ সান্নিধ্য বিনা বিফল হয়ে গেল। কোন কাজেই লাগল না আর। কৃষ্ণের মুখের কথা যেন অমৃতের তরঙ্গ। কিন্তু সে কথা আমি শুনতে পেলাম না। এমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের কিবা প্রয়োজন ছিল, এ শ্রবণেন্দ্রিয় থেকেও কোন লাভ নেই। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কস্তুরীর গন্ধ, এবং নীলোৎপলের সৌরভকেও হার মানায়, কৃষ্ণাঙ্গের সেই অঙ্গগন্ধ আমার নাসাপথ দিয়ে প্রবেশ করল না—এমন নাসা কামার বা স্বর্ণকারদের হাপরের সমতুল্য। কৃষ্ণের অধরামৃত—অমৃতের স্বাদুতার গর্ব্বকেও খর্ব্ব করে, আমার রসনা সেই অধরামৃতের আস্বাদ পেল না, মধুময় কৃষ্ণগুণ চরিতকথা উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে পারল না। অতএব আমার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতোই। ভেক তার জিহ্বা দ্বারা যে রব উচ্চারণ করে সেই রবে আকৃষ্ট হয়ে কালসর্পই তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসে। যে জিহ্বা কৃষ্ণের অধরামৃতের স্বাদ পেল না, যে জিহ্বা কৃষ্ণগুণ চরিত কথা উচ্চারণ করল না, সে জিহ্বাও ভেক জিহ্বা সম কালরূপ অকল্যাণকে আহ্বান জানায় শুধু। কৃষ্ণের কর

এবং পদতল—কোটী চন্দ্রের মতোই সুশীতল; যে তাঁর করের স্পর্শ পেল না, চরণকমলেরও স্পর্শ পেল না—সে দেহ লোহার মতোই কঠিন।

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচন পথং,
তদাস্মাকং চেতো মদন হত কেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরতি পদবীং,
বিধাস্যা মস্তস্মিন্নখিল ঘটিকা রত্ন খচিতাঃ॥

—জগন্নাথ বল্লভ নাটক ৩।১১

শ্রীরাধা বললেন—সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন সহসা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসেছিলেন—তখনই দুষ্ট মন্মথ আমাদের মন হরণ করেছিল। আবার তিনি যখন দৃষ্টিপথে উদয় হবেন,—তা যদি ক্ষণিকের জন্যও হয়—তখন সেই ক্ষণিকের সবটুকু সময় মণিরত্ন দিয়ে সাজিয়ে রাখব (অর্থাৎ সেই ক্ষণ-মুহূর্তকে সাদরে অভিনন্দন জানাবো, অথবা চিরদিনের জন্য ধরে রাখবো)।

শ্রীরাধার মতো কৃষ্ণপ্রেম, অথবা এধরণের প্রেম মানুষে হয় না। আর যদিও হো'ত বিরহ থাকত না, আর যদি বিরহ থাকত তবে কেই বা বাঁচত?

'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহো না জীয়য়॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বিদগ্ধ মাধবে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

পীড়াভির্নবকালকূট কটুতা সর্ব্বস্ব নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমা হঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম যখন বিরহমণ্ডিত হয় তখন সে বিরহ বিষের ব্যথা নব কালকূটের গর্ব্বকে খর্ব্ব করে; আর মিলনে—আনন্দের

ধারা অমৃতের মাধুর্য্যকেও অতিক্রম করে। সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রেম যার অন্তরে জেগেছে—তাঁর কুটিল মধুর ভঙ্গী সেই শুধু জানতে পারে।

শ্রীরাধা তথা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন একান্তভাবে ভালবেসেছিলেন—তাঁরা তেমন একান্তভাবেই পরমপুরুষ গোবিন্দকে পেয়েছিলেন।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ ব্রজসুন্দরীণাম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৬০

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ রূপসী গোপীগণের কণ্ঠ বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভ করেছেন, সেরূপ অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষলগ্না লক্ষ্মীরও লাভ হয়নি। ব্রজ-গোপীগণের অঙ্গে পদ্মের মতো গন্ধ—তা স্বর্গবাসিনীগণেরাও পান নি। অতএব অপরের কথা আর কি বলব।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয় জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্য নুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ।
বাঞ্ছা পূর্ত্তৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা না চান্যা॥

—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১১শ পর্ব্ব

ঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের খনি কে?

ঃ একা শ্রীমতী রাধিকা।

ঃ কেবা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী?

ঃ যাঁর গুণের তুলনা নেই সেই রাধিকাই—আর কেউ নয়। তাঁর কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে তরলতা ও স্তনে কঠিনতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনের বাসনা একমাত্র শ্রীরাধিকাই পূর্ণ করতে পারেন —অন্যে নয়।

শ্রীরাধা অনন্যা, অতুলনীয়া। শ্রীরাধার সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না।

যাঁহার সৌভাগ্যগণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥

পুরুষোত্তম পরম-পতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমে বিবশ, অতএব তাঁর সৌভাগ্যের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎ সিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধয়া পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্ন তারোত্তরা,
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ।।

—উজ্জ্বল নীলমণি ।। অনুভবপ্রকরণ ৭৩

রাধার দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল করুক। দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ রাধার পথরোধ করে দাঁড়ালেন—আর রাধার দৃষ্টি হয়ে উঠল কিলকিঞ্চিতের (মহাভাব) সাতটি ভাবের মঞ্জরী। সে দৃষ্টি গোপন হাসিতে উজ্জ্বল। চোখের পলক অশ্রুতে সজল। চোখের কোণ ক্রোধে ঈষৎ রক্তিম। আবার প্রেমের গর্ব্বে উদ্দীপ্ত সেই দৃষ্টি অভিলাষে মধুর। আবার ভয়ে কুঞ্চিত সেই চোখ—অসূয়ায় বঙ্কিম চক্ষুতারকা।

বাষ্পব্যাকুলিতা রুণাঞ্চল চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং,
হেলোল্লাস সচলাধরং কুটিলিত ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তয়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা—
দানন্দং তমবাপ কোটি গুণিতং সোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ।।

—গোবিন্দ লীলামৃত ৯।১।

গর্ব্বে উল্লসিত রাধার মুখে মৃদু হাসি, অসূয়াজনিত কারণে বঙ্কিম হয়েছে ভ্রূদ্বয়, অবহেলায় চঞ্চল তাঁর অধর, দু'চোখ কান্নায় সজল—ভয়ে ব্যাকুল আর ক্রোধে রক্তিম। কিলকিঞ্চিত (মহাভাবে) ভাবে

সুন্দর শ্রীরাধার মুখপদ্ম দর্শন করে—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম সুখের অপেক্ষা কোটিগুণ বেশী আনন্দ লাভ করেন—তা' ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্য গতিরভূৎ,
তিরিশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নবযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণ বলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥

—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৯।১১

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে—রাধা চলতে চলতে থেমে গেলেন,—কুটিলভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর শ্রীমুখখানি নীলাম্বরী দিয়ে আড়াল করলেন। বিশাল ও চঞ্চল চোখ দু'টিতে—তিনি বিলাস নামে অলঙ্কারে সৌন্দর্যময়ী হয়ে দয়িত শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দ প্রদান করলেন।

[প্রিয় মিলনে যে বিশেষ মাধুর্য্য সাময়িকভাবে ফুটে উঠে—চলায়, থাকায়, বসায় এবং চোখ মুখ ইত্যাদিতে; সেই সাময়িক বিশেষ মাধুর্য্যকেই বিলাস বলা হয়]

হ্রিয়া তির্য্যস-গ্রীবা চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা,
চলচ্চিল্লীবল্লী দলিতরতিনাথোর্জ্জিত ধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিত তনুঃ,
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসী তুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥

—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৯।১৪

ললিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হ'য়ে রাধা দয়িত শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করলেন। লজ্জায় তাঁর গ্রীবা, চরণ ও কটি বঙ্কিম ভঙ্গিতে সুমধুর হ'য়ে উঠল। ভ্রুর কাজলে মদনের ধনুও হার মানল। কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠল তাঁর ললিততনু।

[দেহের নানান ভঙ্গী যখন কোমল ভ্রূ-ভঙ্গীতে মনোহর হয়ে ওঠে তখন তাকে ললিত বলা হয়।]

পাণিরোধম্ বিরোধিতবাঞ্ছং ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥
—গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক ॥ চৈঃ চঃ ম

শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ লাভের বাসনা থাকলেও—তবু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হাত সরিয়ে দিলেন। ভৎর্সনা করলেন—তাও মৃদু হেসে। মুখে মিছে কান্নাও আনলেন সেই করভোরু (করিশুণ্ড সদৃশা উরুযুক্তা) রাধিকা। কৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার এই সকল আচরণ অত্যন্ত মনোহর মনে হ'লো।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার যেমন তুলনা হয় না, তদ্রূপ তাঁর নিত্য-লীলাস্থলী বৃন্দাবনও অতুলনীয়।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬

সেই বৃন্দাবন পরমধামও হয়ে আস্বাদনের (অর্থাৎ উপভোগের যোগ্য।) সেখানে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মীস্বরূপা, কান্ত পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; বৃক্ষসকল কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, কথামাত্রেই গান, চলন মানেই নৃত্য, বংশীই প্রিয়সখি—আর চিদানন্দই তথায় পরম জ্যোতি।

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥
—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ১১।৩০

শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সৎস্বভাব, নৃত্যগীতে নৈপুণ্য, গুণসকল এবং বিদ্যা জগতের মনোমোহন কৃষ্ণেরও মনকে মোহিত করেছে।

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয় বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ —বিদগ্ধমাধব

সখি ! রাধার মনের ব্যথা মোচন সহজ নয়। চিকিৎসা এখানে কেবল মাত্র নিন্দাতেই (অর্থাৎ এর একমাত্র চিকিৎসা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন, ফলে লোকনিন্দা) পর্য্যবসিত হবে।

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরা দুৎকম্পমালম্বতে।
গুঞ্জাতানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রং পরিক্রোশতি॥
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বটন ক্রীড়াচমৎকারিতাং।
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীনগ্রহঃ॥

—বিদগ্ধমাধব ২।১৬

কিশোরী রাধিকা সম্মুখে ময়ুরপুচ্ছ দেখে কেঁপে উঠেছেন। গুঞ্জাফল দেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছেন। জানি না।—কোন নবীন গ্রহ বালিকা রাধিকার মনের রঙ্গভূমিতে নৃত্য-লীলার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা দেখিয়ে প্রবেশ করেছে।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুদা মা রোদীস্মে কুরু পরমিমামুত্তর কৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভূজবল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

—বিদগ্ধমাধব ২।৭০

রাধা বললেন—হে সখি ! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হয় তবে তোমার আর দোষ কি ! মিছে কেঁদো না—বরঞ্চ মরণের পরে এক কাজ ক'রো। তমাল তরুর শাখায় আমার বাহুলতা বেঁধে রেখো, যাতে বৃন্দাবনে আমার দেহ চিরকাল থাকে।

যস্যোৎসঙ্গসুখাশায়া শিথিলতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোহপি সুহৃত্তমাঃ সখি ! তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্ম সোহপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,

ধিক্ ধৈর্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী ॥
—বিদগ্ধমাধব ॥ ২য় অঙ্ক ॥ ২।৬০

শ্রীরাধা বলছেন—

'যাঁর ক্রোড়ে অবস্থিতিজনিত সুখের আশায় গুরুজন সম্বন্ধে গুরু লজ্জাকেও শিথিল করেছি, হে সখি! প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় তোমাদের কষ্ট দিয়েছি, সাধ্বী স্ত্রীগণ যে ধর্ম্মকে পালন করেন—সেই মহৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও গণনা করিনি—আজ সেই কৃষ্ণ কিনা আমাকে উপেক্ষা করলেন। ধৈর্য্যকে ধিক্! তার জন্যেই পাপীয়সী আমি এখনও প্রাণত্যাগ করিনি।

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা,
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতু যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং,
কথং বা ন্যায্যা
তে প্রথয়িতুমুদাসীন পদবী ॥
—বিদগ্ধমাধব

শ্রীরাধা আপন দয়িত কৃষ্ণকে বলছেন—হে কৃষ্ণ! আমরা বাল্য বয়সের স্বভাবানুযায়ী গৃহাঙ্গনমধ্যে খেলা করতাম। ভাল মন্দ কিছুই জানতাম না। এই নিরাশ্রয় দশার মধ্যে কি নিয়ে যাওয়ার যোগ্য আমরা? আর যদি তা নিয়েই থাক তো, এখন তোমার এই উদাসীনতা কি উচিৎ?

অন্তঃক্লেশ কলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চন—সঞ্চয় প্রণয়িনং
হাস্য তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীর কপটে
রাভীর পল্লীবিটে,

হা মেধাবিনি! রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥

—বিদগ্ধ মাধব॥ ২য় অঙ্ক॥ ২।৫৩

শ্রীকৃষ্ণের সামনে ললিতা রাধাকে বলছেন—হৃদয়ের ক্লেশে মলিন হয়ে আজ আমরা মরতে (যমপুরীতে) চলেছি। তবু এই বঞ্চক (কৃষ্ণ) ত্যাগ করছে না তাঁর হাসি—যে হাসি শুধুমাত্র বঞ্চনা করতেই নিপুণ। হে রাধিকা! তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি কি করে প্রতারণায় ভরা গোকুলের এই লম্পটকে এমন গভীরভাবে ভালবাসলে?

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালিমে॥

—গোবিন্দলীলামৃত ৮।৩

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা বিশাখাকে বলছেন—হে সখি! নন্দসুত কৃষ্ণ আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সজোরে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সৌন্দর্য্য সুধার সাগর—যার ঢেউ রমণীর হৃদয় গিরিকে ভাসিয়ে দেয়। লীলাময় তাঁর সুন্দর বচন শুনতেও আনন্দ। কোটী চাঁদের অপেক্ষাও শীতল তাঁর অঙ্গ। তাঁর দেহ সৌরভের অমৃত-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হয়ে গেছে। সুধাময় তাঁর অধর।

চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার,
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থ ভাবকা যমুনোপকূলাঃ,
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাংনঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৯

'রসাল! পিয়াল! কাঁঠাল! অসন! রক্তকাঞ্চন! জাম! আকন্দ! বেল! বকুল! আম! কদম! নীপ!—আরো যারা তরু আছো যমুনার কূলে—পরের জন্যেই তো তোমরা জীবন রেখেছো।

কৃষ্ণকে হারিয়ে আমরা আত্মহারা হয়েছি—বলে দাও, কোন পথে কৃষ্ণ গেছেন।'

শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে করতে ব্রজবালাগণ যমুনা-পুলিনে অবস্থিত তরুগণকে সম্বোধন করে 'কৃষ্ণ কোন্ পথে গেছেন তা জানতে চাইছেন।'

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি! গোবিন্দচরণ প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতি প্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৭

'হে কল্যাণি তুলসী! গোবিন্দ চরণের প্রিয় তুমি। ভ্রমর সমেত তোমার মঞ্জরী তুলে নিয়ে তোমার অতি প্রিয় কৃষ্ণ কোথায় গেছেন—তুমি দেখেছ?'

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চি-ন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৮

'হে মালতি। মল্লিকা! জাতি! যূথিকা!—তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? তোমাদের স্পর্শ করে ক'রে এ পথ দিয়ে চ'লে গেছেন কৃষ্ণ।

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহার প্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥

—গোবিন্দলীলামৃত ৮।৪

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলছেন—সখি! নবীন মেঘের মতো তাঁর কান্তি। নবীন বিদ্যুতের মতো সুন্দর তাঁর বসন। শরতের নির্ম্মল চাঁদের মতোই সুন্দর মুখ। সে মুখে চমৎকার তাঁর মুরলী। ময়ুরপুচ্ছে অলঙ্কৃত, সুন্দর তারার মতন মুক্তার মালা-পরা সেই মদনমোহন—আমার আঁখির পিপাসাকে প্রবর্দ্ধিত করেছে।

বিহার স্বরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারু তারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥

—চৈঃ চঃ অঃ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ

'ঐরাবতের বিহারের জন্য যেমন মন্দাকিনী দিঘী, তেমনি আমার মনের কল্পনা বিলাসের আধার শ্রীরাধা। চকোরের চোখে শরৎকালের উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেমন, আমার চোখে রাধাও তেমন। আমার মনের আকাশে রাধা যেন সুন্দর তারা দিয়ে গাঁথা একগাছি মুক্তামালা। বহুদিনের আকাঙ্খায় আমি রাধাকে পেয়েছি।

অতএব বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার কোন তুলনা হয় না। তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রিয়ভাজনা। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যও তুলনাহীন।

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী,
দধানা রাধাদি প্রণয়-ঘন সারৈঃ সুরভিতাম।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষম সংসারসরণি,
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী॥

—বিদগ্ধমাধব॥ প্রথম অঙ্ক॥ ১ম শ্লোক

শ্রীরাধা মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেছেন—সকল ভাবের ওপরে (দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, শান্ত ইত্যাদি)—এই মধুরভাব, মহাভাব। বৃন্দাবনের গোপীগণের অনুসরণেই গোপীভাবে—শ্রীকৃষ্ণের ভজনা। শ্রীরাধার একান্ত আনুগত্য ও করুণায়—গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণই এক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষ বা দয়িত। সাধক বা সাধিকা এক্ষেত্রে ভাবদেহে শ্রীরাধার দাসানুদাসী রূপে অপ্রকট নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রীতি সম্পাদনের জন্য সদা সচেষ্ট। মধুর ভাবের উপাসনায় সৌন্দর্য্যের সাধনা প্রয়োজন—চিরসুন্দরের সমীপবর্তী হওয়ার আগে

নিজেকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এপথ দুর্গম, ক্ষুরধার—নিত্য আনন্দময়। এ পথ কাপুরুষের জন্যে নয়, দুর্বলের জন্য নয়—, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ভালবাসা আর কৃষ্ণ-করুণা ব্যতীত এধরণের ভজন সম্ভব নয়।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাঁহারই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥"

—চৈঃ চঃ

এভাব অনুধাবনের জন্য গোপীগণের আনুগত্য একান্তভাবেই প্রয়োজন।

"নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য (শ্রেষ্ঠ)॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥"

—চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য গোপীগণের সর্ব্বতোরকম আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে গোপীগণের তাৎপর্য নিহিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা তথা ব্রজগোপীগণের প্রেম তুলনাহীন। এ প্রেমের মহিমার কোন তুলনা হয় না। নৃলোকে, দেবলোকে এবং সত্যাদি কোনলোকে এমনকি পরব্যোমে এবং মথুরায় বা দ্বারকায় এ প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এ প্রেমের দ্বারাই চিরসুবদ্ধ হয়ে রয়েছেন স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।

তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥
পৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস—আস্বাদ কারণ ॥
অতএব সেই বাঞ্ছা অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪৭-৫০

*   *   *

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥
যব এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥'

শ্রীরাধা তথা গোপীগণের প্রেমে আত্মারাম কৃষ্ণ চিরঋণী হয়ে রইলেন। এবং শুধুমাত্র ঋণ স্বীকার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি—সে প্রেম আস্বাদনের জন্য স্বয়ং প্রেমের বিষয় হয়েও, গৌররূপে প্রেমাশ্রয়ের আশ্রিত হয়েছেন তিনি।

ভক্তপ্রবর উদ্ধব শ্রীরাধা তথা ব্রজললনাগণের কৃষ্ণপ্রেমের প্রশংসা করেই নিবৃত্ত হননি—তিনি তাদের শ্রীচরণপরাগের প্রার্থীও হয়েছেন—

আসামহো চরণরেণু জুষামহংস্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

যাঁরা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ করে শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করেছেন—অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ রেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করব।

শ্রীরাধা তথা গোপীগণের আনুগত্য ভিন্ন স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত ভাবে পাওয়া অসম্ভব।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্টুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং,
বিতর বীর। নস্তেঽধরামৃতম্॥

—ভা ১০।৩০।১৪

হে কৃষ্ণ! হে বীর!—তোমার অধরের সুধা আমাদের দান কর। তোমার সে অধরসুধা মিলন-বাসনাকে প্রবর্দ্ধিত করে, শোককে নাশ করে, পঞ্চম সুরের বাঁশী তাকে ছুঁয়ে থাকে সুন্দর ভাবে, এবং মানুষের যত কিছু আসক্তি—সব ভুলিয়ে দেয়।

সখ্য শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদ-বিধোহ্লাদিনী নামশক্তেঃ,
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয় দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস নিচয়ৈ-রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বকোৎ শতগুণ-মধিকঃসন্তি যত্তন্নচিত্রম্॥

—গোবিন্দলীলামৃত ১০।১৬

এক্ষেত্রে ব্রজলোক কুমুদের সঙ্গে তুলনীয়, চন্দ্রের তুলনা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের এক পরমাশক্তি হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর সারাংশ শ্রীরাধা। শ্রীরাধা প্রেমের লতা। শ্রীরাধার সখীরাও প্রায় তাঁরই সমতুল্যা। তাঁরা রাধারূপ প্রেম-লতার যেন ফুল ও পল্লব। চাঁদের অমৃত রসে সিক্ত হ'লে লতা যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, শ্রীকৃষ্ণলীলার অমৃত রসে শ্রীরাধাও তেমন উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সেই উল্লাস দেখে—সখীরাও আরো উল্লসিত হন্। এ আর আশ্চর্য্য কি—যদি পাতায় জলসিঞ্চন না করে মূলকাণ্ডে জলসিঞ্চন করা হয়, পাতাগুলি শতগুণে অধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা যেমন অতুলনীয়া তেমনি রসরাজ কৃষ্ণও অতুলনীয়। যদিও নারায়ণ বা বিষ্ণু মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই—তবুও বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণের তুলনা হয় না। তিনি অনবদ্য, অনন্য। মধুর। মধুর চেয়েও মধুর—অতিমধুর।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

—কর্ণামৃতে ॥ বিল্বমঙ্গল কাব্য

মধুর—মধুর চেয়েও মধুর কৃষ্ণের দেহ। মধুর—মধুর চেয়েও মধুর তাঁর আনন। মধুর সৌরভ তাঁর দেহে, মধুর হাসি তাঁর মুখে—আহা! মধুর, সুমধুর, অতি সুমধুর—সব চেয়ে সুমধুর।

অনির্ব্বচনীয় কোন ভাষার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণকে সঠিক ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ,
ভ্রাজৎকপোল সুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন তত্বপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২৪

তাঁর সুন্দর কানে মকর কুণ্ডল, তাঁর ছটায় কপোল (গণ্ডদেশ) আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। হাসিতে মুখখানি তাঁর সুন্দর, নিত্যই উৎসবময়। নর-নারী দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য্য পান করে তৃপ্তি পায়নি। তারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যেমন আনন্দিত হয়েছে, তেমন আবার কুপিতও হয়েছে—যিনি নিমেষ সৃষ্টি করেছে সেই নিমির ওপর তারা কুপিত হয়েছে।

কৃষ্ণানন দেখে দেখেও আশা মেটে না, যদি কারো লক্ষ নয়ন হ'তো—এবং নয়নে পলক না পড়ত—তবুও আশা মিটত না। অতএব নিমেষকালের জন্য কৃষ্ণানন দেখে যেমন আনন্দ, তেমন আবার দুঃখও জাগে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীয় রূপ দেখে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন—অতএব তাঁর নয়ন বিমোহন রূপ দেখে অন্যান্য লোকেরা মোহিত তো হবেই।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।১২

আপন যোগমায়ার শক্তি প্রকটিত করে তিনি গ্রহণ করলেন মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী রূপ। সে রূপ দেখে তিনি নিজেও বিস্মিত হ'লেন। তাঁর সে রূপ তাই পরম সৌভাগ্যের অর্থাৎ কমনীয় আশ্রয়, অলঙ্কারেরও অলঙ্করণ, অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহ তাঁর শরীরে স্থান পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ শরীরকে সুন্দর করার চেয়ে—নিজেরাই আরো বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছে।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুর্জ নারায়ণ মূর্ত্তি অপেক্ষা দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপকেই ভালবাসতেন, কারণ ঐ পরম পুরুষের যত রূপই থাক—শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। মধুর, সুমধুর—অতি সুমধুর।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী-সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি,
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

—ললিতমাধব ৬।১৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে ভাব অর্থাৎ প্রেম—তা যে ঠিক কি রকমের, জ্ঞানীজনও উপলব্ধি করতে সমর্থ নন। যে চতুর্ভুর্জ

নারায়ণ মূর্ত্তি অতি সুন্দর, ভুবনমোহন—শ্রীকৃষ্ণ সেই নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করলে গোপীগণের প্রেমভাব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত।

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ,
দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং,
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা।

— উজ্জলনীলমণি ॥ নায়িকা ভেদ প্রকরণ

রাসলীলা আরম্ভ হয়েছে। কৃষ্ণ কুঞ্জে লুকিয়ে রয়েছেন। হরিণ নয়না গোপীগণ তাঁকে অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছেন। তাঁদের চোখ এড়াবার জন্য তিনি কৃষ্ণরূপ পরিহার করে চতুর্ভুর্জ নারায়ণরূপ ধারণ করলেন। কিন্তু হায়! রাধার প্রেমের এমনই মহিমা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান হয়েও বহু চেষ্টা করেও শ্রীরাধার সম্মুখে চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি ধারণ করে থাকতে পারলেন না। রাধা প্রেমে বিবশ সেই সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণকেও বাধ্য হয়েই কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে হ'লো।

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা- মনঙ্গবাণ ব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী—তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ (৩য় সর্গ)

এদিকে ওদিকে শ্রীরাধাকে খুঁজে না পেয়ে—শ্রীকৃষ্ণের মনে বড় অনুতাপ হ'লো। তিনি মদনের শরে কাতর হয়ে যমুনাতীরের কুঞ্জে বসে দুঃখ করতে লাগলেন।

পরমানন্দময় মাধবও বিষাদগ্রস্ত হন্—কিন্তু তা' রাধার মত প্রেয়সীর সান্নিধ্য লাভের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের রাধা সহ লীলা একমাত্র রাগানুরাগী ভক্তগণেরই অনুধাবনযোগ্য। সাধারণ মানুষ এই লীলার পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী— স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্—
যুঞ্জন্নদ্রি—নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥

—উজ্জলনীলমণি (স্থায়িভাব প্রকরণ)

বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—'হে গিরিকুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ! তুমি শৃঙ্গার কলার অতি নিপুণ শিল্পী। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাসাদটিকে তুমি বেশ চমৎকার রং লাগিয়ে চিত্রিত করেছো। কিভাবে তা করেছো? প্রথমে তোমার আর রাধার মনরূপ লাক্ষাকে স্বেদ অর্থাৎ প্রেমের তাপে গলিয়ে একসঙ্গে এমনভাবে মিলিয়েছো—যে এ দুই আর পৃথক প্রতীত হয় না (যদিও মূলতঃ ঐ দুই পৃথক নয়; অর্থাৎ অভেদ); শুধু যে মিশিয়েছ তাই নয়—তাতে নব অনুরাগ রূপ হিঙ্গুলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংযোজিত করেছো; তারপরে সেই মিশ্রিত বস্তু দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড রূপ প্রাসাদটিকে চিত্রিত করেছো।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি মতামিহ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯।২১

যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ যত সহজে লাভ করেন, দেহধারী জ্ঞানীগণ—এমনকি ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণও তাঁকে তত সহজে লাভ করতে সমর্থ হন না।

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী।
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ ॥
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু,
র্বিশ্ব বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥

—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১৩।২৯

শুক সারীকে বলছেন—'জগৎকে মুগ্ধ করেছেন আমাদের প্রভু কৃষ্ণ—তিনিই জগৎকে রক্ষা করুন। তাঁর সৌন্দর্য্য সমস্ত রমণীর ধৈর্য্যকে বিনষ্ট করেছে। তাঁর লীলা লক্ষ্মীকেও বিস্মিত করেছে। তাঁর বীর্য্য পর্ব্বত শ্রেষ্ঠকেও হাতের ক্রীড়নক করেছে (অর্থাৎ তাঁর এত শক্তি যে, তিনি খেলাচ্ছলেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করেছেন।) তাঁর গুণ নির্ম্মল ও অনন্ত। তাঁর চরিত সকলকেই আনন্দ প্রদান করছে। তাঁর যশ সমগ্র ভুবন বিদিত।

শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়, তাঁর করুণার অন্ত নেই—

অহো ! বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২৩

আহা ! প্রাণনাশ করার জন্য যে পূতনা কালকূট বিষমিশ্রিত স্তন্য কৃষ্ণকে পান করিয়েছিল—সেও জননীর যোগ্য পরমাগতি লাভ করেছে। অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষা এমন দয়ালু আর কে আছে—যার শরণ নেব ?

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥

—ভক্তি রসামৃতসিন্ধু।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নায়কদের শিরোমণি। তাঁর মধ্যে সমস্ত মহৎ গুণই সর্ব্বদা বিরাজিত বা শোভিত।

মানুষের কল্পনা সুদূরপ্রসারী—কাব্য, নাটকে, গল্প-গাথায়—অনেক নায়কের বিবরণ আবদ্ধ—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা চলে কি ? মানুষের সকল কল্পনাও তাঁর রূপগুণের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। তিনি তর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তি বিশিষ্ট, তিনিই সব।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব সল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভূতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসু পাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত পালকঃ।
সুখী ভক্ত সুহৃৎ প্রেম বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্ত লোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ ঃ

তিনি নেতা, সুতনু ও সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত। সুন্দর, বলবান্, তেজস্বী এবং চির কিশোর। নানা ভাষায় তাঁর অপূর্ব্ব জ্ঞান। তাঁর শ্রীমুখ বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।

ইনি অপরাধীকেও প্রিয় কথা বলেন। ইনি বাগ্মী, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান্ ও বিদগ্ধ (রসিক চূড়ামণি)। ইনি চতুর, কুশল ও কৃতজ্ঞ। তাঁর কখনও ব্রতভঙ্গ হয় না। তিনি দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগিতা ভালো করেই জানেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানী ও সদাচারী। ইনি শান্ত, দান্ত, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। ইনি গম্ভীর, সুধীর ও সমদর্শী। ইনি দানশীল, ধার্ম্মিক, বীর, দয়াময় ও মানীর মান রক্ষা করতে সমর্থ। ইনি সর্ব্বপ্রিয়, বিনয়ী ও লজ্জাশীল। ইনি শরণাগতকে পালন ও রক্ষা করেন। ইনি সুখী, ভক্তবন্ধু ও কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারা বশীভূত। ইনি সকলেরই মঙ্গল সাধন করেন। এঁর প্রতাপ আছে, কীর্ত্তি আছে। সকলেই এঁকে ভালবাসে। ইনি সাধুদের আশ্রয়। রমণীগণের মনোহরণকারী। ইনি সমৃদ্ধিযুক্ত, সকলেরই আরাধ্য। ইনি শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণের কথা বলা হ'লো। সমুদ্রের মতনই গভীর —এই গুণরাশি।

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥

—ভক্তি রসামৃতসিন্ধু

জীবের মধ্যে এগুলির কোন কোনটি অল্প স্বল্প বিদ্যমান থাকে বটে ; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে এই গুণসমূহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

অথ পঞ্চগুণা যে স্যু রংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারি গতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষী ত্যমী কৃষ্ণো কিলাদ্ভূতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভূত চমৎকার লীলাকল্লোলবারিধিঃ॥
অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয়-মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি মুরলী-কল-কূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচরঃ।
লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্য সাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীকৃষ্ণের যে পাঁচটি গুণ আংশিকভাবে শিব প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে বিদ্যমান—সেগুলি সংখ্যায় পাঁচটি গুণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা নিজের স্বরূপে থাকেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ সব কিছু জানেন) নিত্যই তাঁর নবীনতা, আনন্দ-চিন্ময়-ঘন তাঁর দেহ এবং সমস্ত সিদ্ধি তাঁর আয়ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের যে গুণগুলি নারায়ণ প্রভৃতিতে বিদ্যমান—সেগুলিও সংখ্যায় পাঁচটি। যেমন—তাঁর দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত অবতারের মূল তিনি, নিহত শত্রুদের পরমাগতি প্রদান করেন তিনি এবং তিনি আত্মানন্দে বিভোর হয়ে সাধুগণের চিত্তকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বা নিতান্ত বিস্ময়জনক গুণ চারিটি।

তাঁর লীলাতরঙ্গের সমুদ্র সবচেয়ে সুন্দর—সব চেয়ে চমৎকার তাঁর প্রেম মধুর, অতুলনীয় ও প্রিয়জনের ভূষণ স্বরূপ। মুরলীর কলকূজনে ত্রিলোকের মনোনয়নকে তিনি আকর্ষণ করেন। তাঁর চেয়ে বেশি রূপ বা তাঁর সমতুল্য রূপ আর কারো নেই এবং সেই রূপের চমৎকারিতায় চরাচর মুগ্ধ।

লীলায়, প্রেমে ও প্রিয়তায় এবং বেণু বাদনে ও রূপের মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণতা চার প্রকার। সবগুলি মিলে চৌষট্টি গুণ এবং সেই গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত।

ভক্তি নির্ধূত দোষাণাং প্রসোন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি সুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতান্॥
ভক্তনাং হৃদিরাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
পৌরানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥

—ভক্তি রসামৃত সিন্ধু

যাঁরা ভক্ত—তাঁদের সমস্ত দোষ ভক্তি দ্বারাই বিধৌত হয়ে থাকে। মন তাঁদের প্রসন্ন ও উজ্জ্বল। শ্রীভাগবতে তাঁরা অনুরক্ত। ভগবদ্‌ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরা আনন্দ সাগরে অবগাহন করেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তির সুখ-শ্রীতেই তাঁদের প্রাণবত্তা। প্রেমের গোপন সাধনায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন। জন্ম-জন্মান্তরের ও বর্তমান জীবনের উজ্জ্বল অনুভূতিগুলি সংস্কাররূপে তাঁদের হৃদয়ে বিদ্যমান। এই সংস্কারই 'রতি' নামে অভিহিত। রতির স্বরূপ আনন্দ। রতিই রসে পরিণত হয়। স্থায়ী ভাব রতির রসে পরিণতি লাভ করার জন্য প্রয়োজন—বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব। ভক্তির বিভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, অনুভাব-অশ্রু-রোমাঞ্চাদি ও হাস্য-কটাক্ষ প্রভৃতি। সঞ্চারীভাব—গর্ব্ব, হর্ষ

প্রভৃতি। ভক্তদের অনুভব পথে এগুলো জাগ্রত হ'লেই স্থায়িভাব আনন্দঘন রসে পরিণতি লাভ করে। চমৎকারিতার চরম সীমা রসেই পাওয়া যায়।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা রসের চরম সীমাতেই বিশেষ মাধুর্য্য-মণ্ডিত।

ভাগবতে ১০।২৯।৪০ শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে—হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবনে এমন কোন রমণী আছে যে, তোমার মধুময়—অমৃতময় বাঁশীর সুর শুনে আত্মহারা হয়ে কুলধর্ম্ম থেকে বিচলিত না হয়! ত্রিভুবনের প্রিয় তোমার রূপ দেখে গাভী, তরু-লতা ও পশুপাখী পর্য্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠে।

বিদগ্ধমাধবের ১।১০ শ্লোকে বলা হয়েছে—'কৃষ্ণ যেন চন্দ্র! রাধা যেন বিশাখা নক্ষত্র। পৌর্ণমাসী—যেন পূর্ণিমা রাত্রি। বৃন্দাবনে বসন্ত ঋতু এসেছে। পূর্ণ চাঁদে নূতন লালিমা পরিলক্ষিত হয়েছে, কৃষ্ণের মনেও লেগেছে অনুরাগের রঙ। পূর্ণিমা রাতে নয়টি গ্রহ চাঁদের আলোর সমুদ্রে ডুবে গেছে—পৌর্ণমাসীর মনেও রাধা-কৃষ্ণকে মিলিত করার গভীর বাসনা গোপনে প্রসারিত হচ্ছে। বসন্ত পূর্ণিমায় চাঁদ মিলিত হয় বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে। পৌর্ণমাসীরও ইচ্ছা রূপসী রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটাবেন লীলারস আস্বাদন করবার জন্য'।

বিদগ্ধমাধবের ১।৪৪ শ্লোকে বলা হয়েছে—কৃষ্ণের বাঁশীর সুর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করছে। এই বাঁশীর সুরে চলতে চলতে মেঘ থেমে যায়, তম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব প্রতিক্ষণে চমৎকৃত হয়, সনন্দন-প্রমুখ মুনিদের ধ্যান ভেঙ্গে যায়, বিধাতাও বিস্মিত হন, পাতালে বলি ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, নাগরাজের মস্তক ঘূর্ণিত হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের কটাহের আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

আরও বলা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের নয়নশোভা নীলকমলের রূপকেও তিরস্কার করছে। তাঁর পীতবসন নব কুসুমের উজ্জ্বল শোভাকেও বিড়ম্বনা প্রদান করেছে। তাঁর বনবেশ দিব্য বেশকেও হার

একশ' সাতাত্তর

মানিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ নীলমণির মনোহর জ্যোতিতে উজ্জ্বল।

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীরাধা বলেছেন—'এখন কি করি! কাকেই বা বলি! আশায় আশায় যা করার ছিল—তাইতো করা হ'লো। অন্য কোন ভালো কথা বল। আহা! তিনি আমার হৃদয়েই শয়ন করে রয়েছেন। মধুর তাঁর হাসি, মধুর তাঁর আকার। তিনি মনোনয়নের উৎসব। কৃষ্ণে আমার ব্যাকুল তৃষ্ণা চিরদিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯০।৪৮

জয়লাভ করুন শ্রীকৃষ্ণ—যিনি জগতের আশ্রয়, দেবকীর পুত্র বলে খ্যাত, শ্রেষ্ঠ যদুবংশীয়েরা যাঁর সভাসদ্; যিনি নিজের বাহুবলে অধর্ম্ম নাশ করেছেন; নাশ করেছেন স্থাবর-জঙ্গমের সর্ব্বদুঃখকে এবং যিনি আনন্দিত মুখসৌন্দর্য্যে ব্রজগোপীগণের প্রেমকে জাগ্রত করেছেন।

বিদগ্ধমাধবের ১ম অঙ্কের ৩৩শ শ্লোকে বলা হয়েছে—কে জানে-'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দু'টি কত সুধা দিয়ে তৈরী। এক মুখে 'কৃষ্ণ' নামে তৃপ্তি হয় না—প্রবল ইচ্ছা হয় বহু মুখে কীর্ত্তন করার, কানে একবার 'কৃষ্ণ' নাম শুনলে—বাসনা জাগে অনেক কান দিয়ে সেই নাম শোনার জন্য। এবং মনের অঙ্গনে একবার সে নাম উদয় হ'লে—সমস্ত ইন্দ্রিয় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

বৃন্দাবনের শ্রীরাধা যেমন অতুলনীয়া, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তেমন রূপে-গুণে অতুলনীয়। মানুষের কাব্য-কল্পনাও শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। অপরের কথা কি বলব—শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। অমন-নয়ন-বিমোহন রূপধারণ করা স্বাধীন, আত্মারাম এবং স্বরাট শ্রীভগবানের পক্ষেই সম্ভব।

তাঁকে ভালবেসে যে আনন্দ পাওয়া যায়—সে আনন্দের তুলনা হয় না। তাঁর জন্যে কেঁদেও আনন্দ। তাঁর সুখের জন্য, তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও চরম আনন্দ।

আর কৃষ্ণপ্রেমের কথা কি বলব? কৃষ্ণপ্রেম জনিত এককণা আনন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও অত্যন্ত নগন্য বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। কৃষ্ণ বিবহে—বিরহবিষের ব্যথা নব কালকূটের গর্ব্বকে খর্ব্ব করে; আর মিলনে—আনন্দের ধারা অমৃতের মাধুর্য্যকেও অতিক্রম করে।

কৃষ্ণপ্রেমে মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধা ময়ুরপুচ্ছ দেখতে পেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতেন। এমনকি গুঞ্জা ফল দেখেও চোখের জল ফেলতে ফেলতে রোদন করতেন।

নন্দ-নন্দনের প্রেম যার অন্তরে জেগেছে—সেই প্রেমের কুটিল-মধুর ভঙ্গি সম্বন্ধে একমাত্র সেই জানতে পারে। অপরে কি করে জানবে? কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধা তাই কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে বিশাখাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ॥
ক্ব রাসরতাণ্ডবী ক্ব সখি নীবরক্ষৌষধি।
নিধির্ম্ম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥

—ললিতমাধব ৭।২৪

সখি, কোথার সেই নন্দ কুলের চন্দ্রমা? কোথায় তিনি, যাঁর লঙ্কার হয়েছে শিখিপুচ্ছ? মুরলী যাঁর মেঘমন্দ্রের মতো গম্ভীর নি করে। তিনি কোথায়? সেই ইন্দ্রনীল কান্তি কই? রাসলীলার টশ্বর কোথায়? কোথায় সখি, আমার জীবন রক্ষার ঔষধি? মার রত্ন—আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু কোথায়? হায়! হায়! ধিক্। ধাতাকে ধিক্।

রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম াকের মাধ্যমে বলেছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্হতাং করোতু বা।
যথতথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

আমার দয়িত শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করে পদতলেই পিষ্ট করুন, কিংবা সেই লম্পট তাঁর যেমন খুশী তেমন ভাবেই বিহার করুন—তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নয়।

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বূনদ হেম
আত্মসুখের যাহে নাহিগন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥

—চৈঃ চঃ

এ ধরনের প্রেম মানুষে মানুষে হয় না। স্বর্গলোকে, দেবলোকে, ব্রহ্মলোকেও এ-প্রেম বিরল। এ-প্রেম লক্ষ্মীকেও বিস্মিত করেছে। এ ধরণের কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরাধা তথা ব্রজগোপীগণের আনুগত্য ভিন্ন অসম্ভব। বৃন্দাবনই এ প্রেমের যোগ্যস্থান। যেখানকার ভূমি—চিন্তামণিময়, লতা মানেই—কল্পলতা, তরু মানেই—কল্পতরু, কথা মানেই—গান, গমন মানেই—নৃত্য। একমাত্র চির আনন্দধাম বৃন্দাবনই এ প্রেমের যোগ্যস্থান।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতঃ করজাভিমৃষ্টাঃ
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ—
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৫।৮

তোমার চরণ স্পর্শে এই পৃথিবী আজ ধন্য, ধন্য এই তৃণগুল্মগুলি, নখস্পর্শে ধন্য এই তরুলতাদি। তোমার সদয় দৃষ্টিতে নদী, গিরি, পশু ও পাখি ধন্য। ধন্য গোপীগণ যাঁরা তোমার বাহুযুগলের মধ্যে

অবস্থিত বক্ষের স্পর্শ পেয়েছে—যে বক্ষের স্পর্শলাভের জন্য লক্ষ্মীও লালায়িত !

তর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন-লীলবিলাস।

পরম ব্রহ্ম ছিলেন আত্মধ্যানে মগ্ন। নিজেকে নিজে ভোগ করার জন্যও ভালবাসার প্রয়োজন। এককভাবে ভালবাসা চলে না। ভালবাসার প্রয়োজনেই সেই তিনি—এক থেকে হ'লেন দুই। দুই থেকে আবার তিন। তিনি সৎ, যাঁকে পৃথক করলেন তিনি চিৎ। এই দুইয়ের সম্ভোগে উৎসারিত হ'লো চরম আনন্দ। তিনিই সচ্চিদানন্দ—তিনিই বিষয়, যাকে পৃথক করলেন তিনি আশ্রয়।

মিলনে, বিরহে—তর্কাতীত প্রেমমাধুর্য্যে ঘনায়িত হ'লো রস। রসব্রহ্মের সানুভূতি হ'লো প্রকটিত।

বিষয় কৃষ্ণ, আশ্রয় রাধা।

আস্বাদনের চমৎকারিতা এবং রসসম্ভোগের চরম পরিণতিই শ্রীবৃন্দাবনকে করল অনন্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতি মায়াতু।
গোপতিতনয়া কুঞ্জে
গোপবধূটী—বিটং ব্রহ্ম ॥

—হরিভক্তি ও সুধোদয়ে (৯৯)

কার কাছে বা একথা বলব, কেই বা আমার কথা বিশ্বাস করবে—

যে যমুনার কুলে কুঞ্জ মধ্যে তরুণী গোপবধূদের সঙ্গে বিহার করেন স্বয়ং পরমব্রহ্ম।

ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানের দর্শন ও লীলবিলাস—তা' কেবল তাঁরই অতর্ক অচিন্ত্য কৃপাশক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক।

শরীরী ভগবান ও তাঁর শরীর একই পদার্থ ; শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে দেহ-দেহী ভেদ বিদ্যমান নয়।

বেদের ব্যখ্যা যিনি যে ভাবেই করুন—শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন ঃ

'বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহহে কৃষ্ণকে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে বেদান্তের ভাষ্য হচ্ছে—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীব্যাসদেবই বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন, আবার তিনিই বেদান্তের ভাষ্য লিখেছেন। সেই ভাষ্যই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তিনি মুনি, ঋষি বা অতিমানব নন। তাঁর যুক্তির সঙ্গে ঋষি, দেবতা ও মহামানবগণের যুক্তির পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও, তাঁর যুক্তিই গ্রহণীয়—কারণ তিনিই শ্রীভগবানের অবতার।

গৌতমের 'ন্যায়', কপিলের 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', কণাদের 'বৈশেষিক', জৈমিনির 'পূর্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা,' শ্রীশঙ্করের 'শারীরিক ভাষ্য'—এই ষড়দর্শন আলোচনা দ্বারা শুষ্কতর্কের আবর্ত্তে পতিত হয়ে জীবের পক্ষে পরতত্ত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

তাই শ্রীমন্মমহাপ্রভু বললেন—

'তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥

—চৈঃ চঃ মঃ

ঐ ষড়দর্শন থেকে সঠিক ভাবে পরতত্ত্ব নিরূপিতও হয় না। কারণ মানব, মহামানব, ঋষি, মহাঋষি এবং দেবতাদের মনীষার ভ্রম, প্রমাদ, করুণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই চার প্রকার দোষ বিদ্যমান। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা শ্রীবেদব্যাস শ্রীভগবানেরই 'শক্ত্যাবেশ অবতার বিধায়' উপরোক্ত চার দোষ তাঁর রচনায় নেই। অতএব শ্রীবেদব্যাস রচিত বেদান্ত দর্শনই গ্রহণীয়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতই গ্রহণীয়। শ্রীব্যাসদেব স্বয়ং বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন —এবং তিনিই ভাষ্য লিখেছেন। সেই ভাষ্যই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য, গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ এবং বেদশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যযুক্ত।

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ সাকার। ব্রহ্ম অনন্ত গুণরাশির আধার বিগ্রহ, পরমেশ্বর, সর্ব কারণের কারণ।

শাস্ত্র মাত্রেই তাই শব্দাত্মক। যদি পরমব্রহ্ম বিশেষণ রহিতই হ'তেন, তবে শব্দের মাধ্যমে সেই বিশেষণ রহিত বিশেষ্যকে তুলে ধরার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

যদিও শ্রুতিতে বিভিন্নক্ষেত্রে ব্রহ্মকে 'নির্বিশেষ' বলা হয়েছে—সেই 'নির্বিশেষ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'প্রাকৃত-বিশেষত্ব—বৈচিত্র—নিরাস'।

শ্রীমহাপ্রভু তথা গুরুর চরণ স্মরণ করে বলতে পারি তাঁকে সাকার বলুন, নিরাকার বলুন কোন ক্ষতি নেই। 'নিরাকার' ও একটা আকার বটেই। তবে একটা কথা শুধু মনে রাখুন—তিনি নিরাকার হয়েও সাকার হ'তে পারেন, আবার সাকার হয়েও নিরাকার হতে পারেন। তিনিই সব। তাঁকে দেখতে চাইলেই দেখা যায় না।

তিনি কৃপা করে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজ দর্শন সামর্থ প্রদান করেন, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যবানই তাঁকে দেখতে পান। এবং যেহেতু শ্রীভগবান তর্কাতীত অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্ন—একমাত্র তাঁর মধ্যেই সকল বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় সম্ভব। তিনি সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই বিশেষ, তিনিই নির্বিশেষ—তিনিই সব। তিনিই একমাত্র গতি—তিনিই পরমাগতি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে—দেহ-দেহী প্রভেদ বিদ্যমান নয়। তাঁর লীলা বিলাসও অতর্ক অচিন্ত্য কৃপাশক্তির মহৈশ্বর্য্যজ্ঞাপক।

দৃষ্টং শ্রুতং ভূত্যভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ —শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৬।৪৩

অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে—যত কিছু সচল বা স্থির, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তু দৃষ্ট হয় বা শোনা যায়—সে সকলের তত্ত্ব বিচারে কৃষ্ণ

ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করা যায় না। তিনিই সমস্ত কিছুর পরামাত্মা।

শেষের কথা এবার বলি—আমার মতো অযোগ্য বা নরাধমের পক্ষে 'কৃষ্ণকথা' লেখার যোগ্যতা লাভ এক অসম্ভব ব্যাপার। আমার গুরুদেব শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীই যেন আমার মাধ্যমে এই 'কৃষ্ণকথা' জোর করে লিখিয়ে নিলেন। বহু বৈষ্ণবভক্তও নানাভাবে আমার মনোনয়নকে কৃপার আলোকে ধন্য করলেন।

আমি অপদার্থ, সেই অকৃপণ কৃপা ধারণ করারও যোগত্য আমার নেই, শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণব ভক্তদের সাময়িক অকৃপণ কৃপায় আনন্দবিবশ হয়েই 'কৃষ্ণকথা'কে তুলে ধরতে পারলুম মাত্র।

"হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী॥
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি॥"

কি ভাবে লিখলাম—জানিনা, কেনই বা লিখলাম—তা জানিনা। কত জন্ম জন্মান্ত পরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আমার মনোনয়ন ধন্য হবে তাও জানিনা। যেখানেই থাকি, যে ভাবেই জন্মগ্রহণ করি—তাঁর প্রিয়ভক্তদের চরণরেণু আমার শিরে বর্ষিত হো'ক—এই প্রার্থনা।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৬৫

প্রণাম করি বারবার ব্রহ্মণ্যদেবকে, গোব্রাহ্মণের কল্যাণকারীকে, জগতের হিতসাধক সেই কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে।

—সমাপ্ত—